তাফসিরে

সূরা তাওবা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম (রহ.)

মুফতি মাহ্দী খান অনূদিত

তাফসিরে সুরা তাওবা

[দ্বিতীয় খন্ড]

ড. শহিদ আবদুল্লাহ আযযাম রহ.

প্রকাশনায়
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

সূচিপত্র

ষট্‌ত্রিংশ মজলিস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

'এবং কিছু লোক এমন, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতিসাধন করবে, কুফরি কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যে ব্যক্তির যুদ্ধ রয়েছে তার জন্য একটি ঘাঁটির ব্যবস্থা করবে। তারা অবশ্যই কসম করবে যে, "আমরা ভালো উদ্দেশ্যেই এটা করেছি।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

(হে আমার রাসুল!) আপনি তাতে (অর্থাৎ তথাকথিত সেই মসজিদে) কখনো নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, সেটিই আপনার (নামাজের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ানোর অধিক উপযুক্ত। তাতে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।

আচ্ছা, সেই ব্যক্তি উত্তম, যে আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টির ওপর নিজ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে, নাকি ওই ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারায়, ফলে সেটি তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

তারা যে ইমারত তৈরি করেছিল, তা তাদের অন্তরে নিরন্তর সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। ফলে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়। এ যুদ্ধের দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার রয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জিলে এবং কুরআনে; আর নিজ অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর তা-ই তো মহাসাফল্য!

তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকুকারী এবং সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজ থেকে বাধাপ্রদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর আপনি (এমন গুণবিশিষ্ট) মুমিনদের (আমার পক্ষ থেকে) সুসংবাদ প্রদান করুন।' [সুরা তাওবা : ১০৭-১১২]

বিগত আলোচনায় আমরা মসজিদে জিরার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর সে ঘটনার অন্যতম নেপথ্যনায়ক ছিল পাদ্রি আবু আমের; যে কিনা হাওয়াজিন যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের পরাজয় সুনিশ্চিত হওয়ার পর ভেগে পালিয়ে যায়। বাস্তব কথা হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তাদের অস্তিত্বই একরকম মিটে যায়। এরপর এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় হুনাইনের যুদ্ধ, যেখানে হাওয়াজিন এবং সাকিফ গোত্র পরাজয় বরণ করে। আর এভাবে আরব উপদ্বীপে বাস্তবিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটে। মানুষ এবার দলে দলে আল্লাহর পছন্দনীয় দীন ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। আরব উপদ্বীপের মানুষেরাও এসে তাদের ইসলামে প্রবেশের ঘোষণা দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নবিজি যখন তাঁর প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেন, ততক্ষণে সমগ্র আরব ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।’ [সুরা মায়েদা : ৩]

হাওয়াজিন পরাজয়ের পর আবু আমের কুস্তুনতুনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং রোমের বাদশা কায়সারকে আরব উপদ্বীপে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। আরবে যারা মুনাফিক ছিল, তাদের সাথে তার চিঠি চালাচালি হতে থাকে। তারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল রাসলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি ফাঁদ হিসেবে। আশঙ্কা ছিল, তারা এটাকে রাসলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ধ্বসিয়ে দিত। আর এভাবে তারা তাঁকে হত্যার দুরভিসন্ধি করছিল।

একটু ভাল করে লক্ষ করুন, স্বয়ং রাসুল ﷺ তাদের মাঝে অবস্থান করছেন, একের পর এক যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে খোদায়ি মদদপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তাঁর হাত ধরে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম উম্মাহর বিজয় আসছে, এসব দেখে তারা তাঁর

আমানতদারি এবং সত্যবাদিতার কথা ঠিক বুঝে নিয়েছে। তাঁর ওপর নিজ প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অগণিত নিদর্শন এবং অসংখ্য মুজিযা অবতীর্ণ হয়ে চলছে, আর তারা পাশে থেকে দিনরাত স্বচক্ষে এসব প্রত্যক্ষ করছে! তাদের মাঝেই নবিজি ﷺ তেরোটি বছর কাটিয়েছেন, তারপরও তারা তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেই চলছে, দিনরাত তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চক্রান্ত করছে, তাঁর জন্য নানা ফাঁদ তৈরি করছে, তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা কৌশল আঁটছে, তাঁর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং তাঁকে বিদায় করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যয় করছে!

কুটিল স্বভাবের এসব মানুষের জন্য বয়ান এবং ওয়াজ নসিহত কোনো কাজেই আসেনি। অকাট্য সব দলিল-প্রমাণ তাদের ওপর কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। দলিলের পর দলিল এসেছে; এতে যারা পরিতুষ্ট হওয়ার তারা ঠিকই পরিতুষ্ট হয়েছে। আর যারা দুর্ভাগা, অসংখ্য অগণিত উজ্জ্বল প্রমাণ স্বচক্ষে দেখার পরও তাদের অবস্থা ছিল তথৈবচ! কুরআনে আল্লাহ বলছেন—

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا.

'তারা যদি সকল নিদর্শনও দেখে নিত, এরপরও তারা সেসবের প্রতি ঈমান আনত না।' [সুরা আনআম : ২৫]

সুতরাং তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য তরবারি ব্যতীত আর কোনো পথই খোলা থাকেনি! তাই তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে—

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

'যখন হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাবে, সেখানেই হত্যা করবে!' [সুরা তাওবা : ৫]

আর এমন অবস্থায় আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের জন্যও দুটো সিদ্ধান্তের কোনো একটি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না— হয়তো তারা ইসলামে

প্রবেশ করবে, কিংবা তারা আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করবে। আর যদি এ দুটোর কোনোটিই তারা না করে তাহলে তাদের হত্যা করা হবে।

এ কারণে ইকরামা, কাব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সালামা আরব থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তবে আল্লাহ তাআলা যেহেতু মানুষের ব্যাপারে কল্যাণের ফায়সালা করার ইচ্ছা করলেন, কুফফার গোষ্ঠীও তাদের নিজেদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করল, এমনকি নবিজি ﷺ-ও তাদের নিরাপত্তা প্রদান করলেন; ফলে তারা সদলবলে ইসলামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাআলার দীনকে সাহায্য করল এবং দীনের বিজয় নিশ্চিত করল। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

আমি বলব, তাদের মধ্যে এমনসব লোকও রয়েছে, সুদীর্ঘকালের বয়ান-বক্তৃতা এবং ওয়াজ-নসিহত যাদের কোনো উপকারে আসেনি। অগণিত প্রমাণ এবং নিদর্শন, অব্যাহতভাবে অবতীর্ণ হওয়া মুজিযা এবং অলৌকিক ঘটনা যাদের ভেতরে কোনো সাড়া জাগায়নি! এতকিছুর পরও অনেক মানুষই এমন রয়ে গিয়েছিল, যারা সেই রাসুলের বিরুদ্ধেই বদদুআ করত, যাঁর ওপর সকাল-সন্ধ্যা ওহি অবতীর্ণ হচ্ছে। সরাসরি আসমান থেকে যাঁর কাছে নানা সংবাদ-প্রত্যাদেশ আসছে! এ পর্যায়ে তাদের জন্য তরবারি ছাড়া আর কোনো প্রতিষেধক আছে কি?

এরপর যদি আমরা ইসলামি দাওয়াতের পন্থা ও পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বিষয়টা মোটেও আশ্চর্যজনক বোধ হবে না! কারণ, এ তো মানবীয় স্বভাব। মানুষের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে, যাদের স্বভাব-প্রকৃতিই হচ্ছে বিনষ্ট! এমন কিছু লোকও রয়েছে, যাদের ওপর শয়তান ভর করেছে! অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং অন্যান্য সুস্পষ্ট বিষয়াদি দেখার পর কারও জন্য একেবারে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে দলিল-প্রমাণের বিষয় নয়, সত্য-মিথ্যারও কোনো বিষয় নয়, নবি-রাসুল-সংশ্লিষ্টও কোনো বিষয় নয়; বিষয় হচ্ছে ভেতরের ভয়াবহ ব্যাধি, অপারেশনের ছুরি-তরবারিই কেবল যা সারাতে পারে।

বক্র হাঁটু তলোয়ারের অপারেশন ব্যতীত ঠিক হওয়ার নয়।
তা কেটে ফেলো এবং সম্মুখপানে হেঁটে চলো।

আপনি যদি কাউকে আফগানের জিহাদ নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে দেখেন তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারেও তো কথা হয়েছে। আর তা কখন? নবুওয়তের দলিল-প্রমাণের উজ্জ্বল তেরোটি বছর তাদের মাঝে অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এমনকি তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তারা তাকে হত্যা করে ফেলার দুরভিসন্ধিও করেছিল। তারা তাকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য ফাঁদ পেতেছিল। উটের পিঠের রশি কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যাতে করে নবিজি ﷺ-এর উটটি কোনো উপত্যকা বা সংকীর্ণ জায়গায় পড়ে যায় এবং নবিজি ﷺ আঘাতপ্রাপ্ত হন। তবে তারা এতে সফল হলো না। তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হলো। ওহির মাধ্যমে তাঁকে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। তখন আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ মুনাফিকদের পক্ষে ব্যবহৃত মুশরিকদের উটের মুখে আঘাত করলেন। তারা চেয়েছিল, উটকে উত্তেজিত করে উটনীর ওপর লেলিয়ে দেবে, যেন নবিজি ﷺ-এর উটনীটি পড়ে যায়, নবিজি পড়ে যান! তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর ওপর মসজিদ ধ্বসিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারাও তারা করেছিল!

সুতরাং দলিল-প্রমাণ এখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং রুগ্ন হৃদয়, বিনষ্ট অন্তর, বক্র প্রবৃত্তি এবং বিকারপ্রাপ্ত চিত্তই মূল কারণ। তাই তা শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত নত হওয়ার নয়। আর এ সমস্যা প্রতিটি কাল আর প্রতিটি স্থানেই বিদ্যমান। এ কারণে আরব উপদ্বীপের নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি নিজেদের জন্য কখনোই মেনে নিতে পারেনি। এমনকি মক্কা বিজয়ের পরও মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করেছিল। একবার এক মজলিসে মক্কার নেতৃস্থানীয় তিনজন বসা ছিল। তারা ছিল আবু সুফিয়ান, আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম আর তৃতীয় আরেকজন। তাদের প্রথমজন (সম্ভবত তিনি আবদুর রহমান) বলে উঠল, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি হারিসকে এই দিনটি দেখার পূর্বেই মৃত্যু দান করেছেন, ফলে তাকে আর এই দৃশ্য দেখতে হয়নি যে, মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করছে আর বেলাল কাবার ওপর চড়ে আজান দিচ্ছে।'

অপরজন বলল, মুহাম্মাদ কি এই কালো কাকটি ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেল না? এই কালো কাকটা কিনা কাবার ওপর উঠছে এবং উঠে তার ওপর আজান হাঁকাচ্ছে!

আবু সুফিয়ান, তোমার কী মত, বলো তো দেখি!

তিনি বললেন, আমি যদি কথা বলি তাহলে আমার ব্যাপারে এই পাথরটিও কথা বলবে।

সেই একমাত্র ব্যক্তি, যে খুব ভালো করেই বুঝেছিল যে, রাসুল কী জিনিস? তাই সে ভয় পাচ্ছিল। কারণ, সে যদি এখন মুখ খোলে তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ অতিসত্বর তা জেনে যাবেন।

ইত্যবসরে সেই জায়গা দিয়ে নবিজি ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন-

হে অমুক, তুমি এ কথা কেন বললে?

হে অমুক, তুমি এ কথা কেন বললে?

পরবর্তীতে আবু সুফিয়ান তাদের বললেন, আমি বলেছিলাম না, পাথরও তাকে সংবাদ দিয়ে দেবে। পাথরও তাকে সব জানিয়ে দেবে। আর এ কারণেই তোমরা চুপ থাকো।

যখন তারা আর পরিত্রাণের কোনো উপায়ই পেল না, মূর্তিপূজার কেন্দ্রবিন্দু মক্কার পতন হলো আর এভাবে আল্লাহ এ ভূমিকে কিয়ামত পর্যন্ত শিরক থেকে পবিত্র করে তাওহিদের রাজধানীতে রূপান্তরিত করলেন। যেমনটি নবি করিম ﷺ ঘোষণা করেছেন, 'শয়তান নিরাশ হয়ে ফিরেছে যে, তোমাদের এই ভূমিতে আর তার উপাসনা করা হবে না, তবে এ ছাড়া অন্য বিষয়ে সে সন্তুষ্ট! অর্থাৎ একজন অপরজনকে হত্যা করবে, কেউ চুরি করবে, কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হবে- এসব বিষয়ে সে সন্তুষ্ট। তবে শিরক থেকে তা চিরদিনের জন্য মুক্ত। মুসলিমরা এ ভূমিতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছেন। আর যাও, আজ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হলো, তোমরাও মুক্ত।

হুনাইন যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবিগণ পরাজয় বরণ করেছিলেন। আবু সুফিয়ান সেদিন বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আজ তোমাদের পরাজয় সাগর পর্যন্ত গিয়েও শেষ হবে না। কালদা ইবনে হাম্বল- যে কিনা মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের একজন ছিল, বলল- এখন তো জাদু অকৃতকার্য হয়েছে, সব কৌশল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

এরাই তো সেই নেতৃবর্গ, তরবারি ছাড়া যাদের কিছুতেই অবনমিত করা যায়নি। আর তাই সেই আরব উপদ্বীপও তরবারির শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অবনমিত হয়নি এবং এমনি এমনিই ইসলামি সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়নি।

হে আমার ভাই, আল্লাহ তাআলা তো ঐক্যের প্রতি আহ্বান করেছেন- 'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো!'

আজ যারা হৃদয়ের ক্যানভাসে এই অলীক স্বপ্ন আঁকে যে, জনগণের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টিক্রমেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সার্বজনীন ঐক্য সৃষ্টি হবে; অথবা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াসেই ইসলামের বিধানাবলি বাস্তবায়িত হবে, দীনের মর্যাদা যথাযথভাবে অটুট থাকবে ইত্যাদি, এ সবকিছু এতটাই অবাস্তব, যেমন স্মৃতিপটে অঙ্কিত কল্পনাগুলো অবাস্তব! কাল্পনিকভাবে সম্ভব মনে হলেও আদতে এগুলো দুরূহপ্রায়।

ইসলামের লালনভূমি হওয়া সত্ত্বেও আরব উপদ্বীপ তরবারির ধার ব্যতীত ঐক্যবদ্ধ হয়নি; না আল্লাহর রাসুলের হাতে হয়েছে, না আবদুল আজিজের হাতে হয়েছে! কাফেরদের যখন তরবারি দিয়ে মুণ্ডুপাত করা হবে তখন তারা বিনয়নম্র হবে। তরবারি ব্যতীত কখনোই তারা বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করবে না।

আর এ কারণেই যারা আফগান মুজাহিদগণের কাছে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে যে, সে দেশের আঠারো মিলিয়ন মানুষ যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে, সকলে মিলে একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ করে এবং সকলে মিলে একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করে তার অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে যায়, আর এ সবকিছুই যেন হয়

নসিহতের মাধ্যমে- "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো!" "মুসলমান মুসলমানের ভাই।" "আল্লাহর সাহায্য জামাত ও দলবদ্ধ লোকের ওপর।" অথচ সে ব্যক্তি নিজে হয়তো কখনো রুটি খেয়ে দেখেনি, তাদের এসব প্রত্যাশা এবং আবদারকে আমলে নেওয়া যায় না। কারণ, এসব নসিহত যদিও উত্তম মানসিকতার অধিকারী বিশেষ ঘরানার লোকদের জন্য উপকারী; কিন্তু এসব জাতি-গোষ্ঠী, যেখানে রয়েছে মুনাফিকদের ছড়াছড়ি, যেখানে রয়েছে দাজ্জালেরা, যেখানে রয়েছে আমেরিকার সঙ্গে আঁতাতকারী অগণিত মানুষ, যেখানে অসংখ্য মানুষ জিহাদকে পুঁজি করে বাণিজ্য করে যাচ্ছে নিত্যদিন, সেখানে এসব মিষ্টি মিষ্টি কথায় কি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে? আদৌ কি তা সম্ভব?

আরবরা একবার কয়েকদিনের জন্য কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে করে নিয়ে পেশাওয়ারে এলো। তারা এখানে এসে আন্তমহাদেশীয় এক ভিআইপি হোটেলে উঠল। সেখানে বসেই বিভিন্ন নেতাদের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠাতে থাকল- 'হে ভাইয়েরা, এসো, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, একতার বন্ধনে পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত হই। তোমরা নিজেদের একজনকে নির্বাচন করো; কোনো সাহসী যোদ্ধাকেই নির্বাচন করো!'

এভাবে এ পন্থায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। শক্তিশালী এবং সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐক্যের আহ্বান বাস্তবায়িত হবে। সেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে মুমিনরা আনুগত্য প্রকাশ্য করার মাধ্যমে বিনয়াবনত হবে, আর বিদ্বেষ-পোষণকারীরা অপদস্থতার সাথে আনুগত্য প্রকাশ করবে। এ ছাড়া এসব ঐক্যের গীতি অযৌক্তিক!

আর এ কারণেই বিভিন্ন সময়ে ঐক্যের ডাক সফল হয়নি আর কখনো তা সফল হবেও না। এটা সম্ভব নয়। কারণ, এখানে এমন কিছু যোদ্ধা বা সৈন্য প্লাটুন রয়েছে, যারা জিহাদকে ব্যবসার বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে। এমন কিছু যোদ্ধা আছে, যারা কাবুলের অভ্যন্তরীণ চরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। এমন কিছু লোকও আছে, যারা অস্ত্র ঠিকই বহন করছে, তবে তারা রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের থেকেই কি আপনি একতার আশা করছেন! তারা কখনোই

ঐক্য এবং একতা মেনে নেবে না। তরবারি, ক্লাশিনকোভ বা বি.এম ২১-এর বল প্রয়োগ ব্যতীত তারা কখনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করবে না। তুমি চলো... আমিও চলছি...। চলবে না? তাহলে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দাও! কারণ, যে একই মিশন নিয়ে তোমাদের কাছে আসল এবং পরবর্তীতে তোমাদের জামাআতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চাইল, সে যেই হোক না কেন, তোমরা তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলো।

আর এ কারণেই উমর ﷺ যখন আক্রান্ত হলেন তখন তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির মধ্য থেকে তখন পর্যন্ত জীবিত থাকা ছয়জনের কাছে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন। এরপর আপনাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করুন। সকলের সম্মতিক্রমে কোনো একজনকে নির্বাচন করার পর আপনাদের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছয়জন সাহাবির) মধ্য থেকে যে-কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, আপনারা তার মাথা কেটে ফেলবেন। তিনি আলি ﷺ এবং উসমান ﷺ-এর কাছেও সংবাদ দিয়ে পাঠালেন যে, হে আলি, তোমাকে যেন এ বিষয়টি ধোঁকায় না ফেলে যে, তুমি নবিজির জামাতা, তাঁর চাচাত ভাই এবং ওহির লেখক। যদি তুমি ছাড়া অন্য কাউকে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নির্বাচিত করা হয় তাহলে তুমি তাকে মেনে নিয়ো; নতুবা তরবারি তোমার ফায়সালা করবে।

হে উসমান, তোমাকে যেন এ বিষয়টি ধোঁকায় না ফেলে যে, তুমি জুননুরাইন। তুমি ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নির্বাচন করা হয় তবে তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ো; অন্যথায় তরবারি দিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে!

এটাই তো উম্মতের পথরেখা! যদি সে উসমানও হয়, যদি সে আলিও হয়, আর যদি সে আনুগত্য প্রদর্শন না করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে কিংবা তাকে ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে। সে ইসলামি রাষ্ট্র থেকে দূরে মুশরিকদের কোনো অঞ্চলে বসবাস করবে। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, তাকে আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য করতে

হবে, আমিরুল মুমিনিনের হাতে বাইয়াত দিতে হবে; এতে তার আন্তরিক সন্তুষ্টি থাক কিংবা অন্তরভর্তি ক্রোধ এবং বিদ্বেষ থাক। সর্বাবস্থায় তাকে আমিরুল মুমিনিনের হাতে বাইয়াত দিতেই হবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নিতেই হবে। আবার কোনো দেশ এবং কোনো রাষ্ট্রে একের অধিক আমির থাকতে পারে না। কুরআনে বলা হচ্ছে—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

'যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত আরও কিছু উপাস্য থাকত তবে তা ধ্বংস হয়ে যেত।' [সুরা আম্বিয়া : ২২]

আর এ কারণেই বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলা অটুট রয়েছে, তার নিয়মরীতি অক্ষুণ্ন এবং অবিচল রয়েছে। কারণ, তার নিয়ন্ত্রক একক ইলাহ, তার পরিচালনাকারী মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি শরিক এবং অংশীদার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ঠিক একইভাবে পৃথিবীতেও যদি একাধিক আমির থাকে তাহলে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। কারণ, এক আমির রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে চাইবে, অপরজন তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপর কিছু লোককে নিয়োগ দিতে চাইবে। একজন চাইবে, তার আদেশ বাস্তবায়ন হোক; অন্যজন চাইবে, তার নির্দেশ কার্যকর হোক। এসবের আবশ্যকীয় ফল হচ্ছে দুর্যোগ, বিপর্যয় এবং চরম বিরোধ। তাই এ কাজটি অদ্বিতীয় নেতা ব্যতীত বাস্তবায়ন হবে না।

এ ক্ষেত্রে আপনি হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবেন, তবে আফগান কি একতাবদ্ধ, না বিভক্ত?

আমি বলব, তারা একতাবদ্ধ নয়। তারা কখনো একতাবদ্ধ হবেও না। এটা অসম্ভব! সৃষ্টির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সুশৃঙ্খল শক্তিশালী একচ্ছত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল মানুষ অনুগত হবে। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত মানুষ কখনোই

আনুগত্য আর বশ্যতা স্বীকার করবে না। নসিহত, ওয়াজ, বয়ান, মিহরাব আর মিম্বারকেন্দ্রিক মেহনতের মাধ্যমে এ সকল মানবাত্মা বশ্যতা স্বীকার করবে না। কারণ, তা সৃষ্টিগতভাবেই কুঁজো এবং বক্র। তা তো কেবল ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে। এ সকল মানবসত্তার দৃষ্টান্ত হলো মাছির মতো। আপনি কি কখনো মাছিকে শুকনো, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র জায়গায় বসতে দেখেন? সে তো ময়লার ঝুড়ি এবং গোবরের স্তুপে থাকতেই পছন্দ করে। এ সকল মানবাত্মার দৃষ্টান্ত ঠিক সেই মাছির মতোই।

এখানে আমি আপনাদের একটি সুসংবাদ দিতে পারি যে, [আফগানে] জিহাদ অব্যাহত রয়েছে এবং তা সফলতার মুখও দেখছে। এই আফগানবাসীই ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের পর (১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং ১৮৭৮ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) তিন তিন বার তাদের পরাজিত করেছে, তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে; অথচ তখনও আফগানবাসীর মধ্যে ছিল শত শত গোত্র, দল এবং উপদল। আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা, বর্তমানে সেখানে রয়েছে মাত্র সাতটি গোত্র এবং সাতটি দল। পুরো আফগানকে আপনি এখন সাতটি ভাগ ধরতে পারেন। কথা হলো, এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, এই সাতটি ভাগ একতাবদ্ধ হবে।

আমার এ কথাটি লিখে রাখতে পারেন, তাদের মধ্যে ঐক্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, তা বলপ্রয়োগ ব্যতীত কখনোই সম্ভব নয়। বিশ্ববাসীর কারও জন্য যদি বলপ্রয়োগ ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তা পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের আদর্শিক নেতা নবি কারিম ﷺ-এর দ্বারাই সম্ভব হতো। এই আরবও নবিজির তখনই হস্তগত হয়েছে, যখন তিনি কুফরের মাথাসমূহকে বিচূর্ণ করেছেন, তাদের আধিপত্য গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং ওইসব গোত্রপতিদের পদদলিত করেছেন।

এরপর সব কষ্ট লাঘব হয়েছে। আর একেই বলা হয়, রাঘব বোয়াল শিকার করো, পুঁটি মাছগুলো এমনিই শিক্ষা পেয়ে যাবে। বড় ষাঁড়টাকে আঘাত করলে ছোট ছোট গরুগুলো আপনাআপনিই ভদ্রতার সবক পেয়ে যায়। অনেকটা বউকে মেরে ঝিকে শেখানোর মতো। নবিজি ﷺ যখন রাঘব

বোয়ালগুলোকে শায়েস্তা করলেন তখন চুনোপুটিগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে লাগল। এরপর কিছুকালের মধ্যেই তারা রাঘব বোয়ালই নয়, বরং তিমি ডলফিনে পরিণত হলো।

এই যে তারা মসজিদ নির্মাণ করল, যে মসজিদকে 'মসজিদে জেরা'র বলা হয়, এর ব্যাপারে নবিজির কাছে ওহি নাযিল হলো, তাঁকে এ মসজিদ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো, তিনি যেন তাতে নামাজ আদায় না করেন— 'আপনি কখনোই তাতে (নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবেন না।'

আর এ কারণে মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ বলেন, এখানে যদি [মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে] ক্ষতির উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে তবে তার বিধানও তা-ই হবে, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে নির্মিত মসজিদে জেরার'ই ছিল। কোথাও একটি মসজিদ বানানো হলো, যেখানে মুসলিম যুবকরা নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হচ্ছে। এরপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আরেকটি মসজিদ গড়ে উঠল ঠিক তার পাশেই। এমনকি পূর্বেরটিকে নষ্ট করে ছাড়ল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তার জন্য একজন নিয়মিত ইমামও নিয়োগ দেওয়া হলো। এরপর মসজিদের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি করতে লাগল। তবে এমন ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করা বৈধ হবে না। এমন মসজিদেও নামাজ পড়া বৈধ হবে না। কারণ, তার ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে জাহান্নামের ধ্বংসন্মোখ কিনারে। মুসলিম সমাজের মধ্যে বিবাদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার মানসে। এটিই তো কুরআনের আয়াতের বিবৃত সেই মসজিদের বৈশিষ্ট্য—

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

['এবং কিছু লোক এমন, যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতি সাধন করবে, কুফরি কথাবার্তা বলবে এবং মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।'] যার উদ্দেশ্যই সমাজবাসীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি সৃষ্টি। এমন মসজিদে নামাজের উদ্দেশ্যে গমন করা যাবে না।

এমনিভাবে আজকের বিভিন্ন দীনি মারকাজগুলোরও অবস্থা ঠিক একই। কোথাও হয়তো কোনো মারকাজ-দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষণাগার সফলভাবে সুনামের সঙ্গে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। হঠাৎ কেউ একজন উড়ে এসে জুড়ে বসল, যে কিনা জুলুমবশত এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি, তার পরিচালনার প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতা রাখে, কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং কিছু লোক জড়ো করে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। এবং এরপর পুরোনো মারকাজ থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। শরিয়তের দৃষ্টিতে পরবর্তী মারকাজটিতে প্রবেশ বৈধ হতে পারে না। কারণ, তার অবস্থা সেই মসজিদে জেরারের মতোই।

ঠিক এমনিভাবে যেখানে এমন কোনো বিদগ্ধ ইমাম আছেন, যিনি তার ইলম এবং তাকওয়ার কারণে সর্বমহলে সুপরিচিত, একদিন তাঁর মসজিদে কেউ একজন এসে উঠল, যার কাজই হচ্ছে, তার সব ব্যাপারেই গণ্ডগোল পাকানো এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যখনই সেই বিদগ্ধ ইমাম কোনো কথা বলেন তখনই সে বলে ওঠে, অমুক তো এমন বলেছেন, তমুক ফকিহ তো এ কথা বলেছেন! এ ব্যক্তির ব্যাপারে করণীয় হচ্ছে, প্রথমবার তাকে নসিহতের মাধ্যমে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া। এরপরও যদি সে শুধরে না যায় তাহলে দ্বিতীয়বার অগ্নিশর্মা চোখের শাসানির মাধ্যমে তাকে বের করা হবে। এতেও কাজ না হলে তৃতীয়বার গায়ে হাত তুলে তাকে শায়েস্তা করা হবে। কথাটি বুঝেছেন তো? কারণ, সে উজাড় করার স্বার্থেই আগমন করেছে। সে নিজেই আস্ত একটা মসজিদে জেরার। তার সত্তা-প্রকৃতিটিই হচ্ছে মসজিদে জেরার।

উস্তাদ হাসান আল বান্না রহ., যিনি কিনা ইসমালিয়া প্রতিষ্ঠানের একজন উস্তাদ ছিলেন। তিনি জামিয়াতু দারুল উলুমে প্রথম স্থান অধিকারী ছিলেন। আমাকে তার ব্যক্তিগত সচিব বর্ণনা করেন যে, একবার বিগত পরীক্ষার ফলাফল জেনে একজন ছাত্র তার কাছে এল। সে এসে বলল, হে শায়খ, আপনি অমুক অমুক বিষয়ে পরিপূর্ণ নাম্বার পেয়েছেন। এ কথা শুনে উস্তাদ হাসান আল বান্না রহ. কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সিজদা করলেন। তখন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে ছাত্রটি বলে উঠল, আমি আপনাকে বললাম, আপনি পূর্ণতায় পৌঁছেছেন, আর আপনি কিনা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সিজদা করছেন! তিনি বললেন, আমরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করি। সে তাঁকে বলল, শায়খ হাসান, আপনার জন্য আরও সুসংবাদ রয়েছে। আপনি পুরো জামিয়া দারুল উলুমে সকলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন! এ কথা শুনে উস্তাদ হাসান আল বান্না রহ. পুনরায় সিজদা করলেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর পরের ঘটনা। জামিয়া কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জামিয়ার উত্তীর্ণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। এটা ১৯৭২ সালের ঘটনা। তখন দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী হাসান আল বান্না রহ.-এর ব্যাপারে শর্তারোপ করলেন যে, তাঁকে অনুষ্ঠানস্থলে ইংরেজদের মতো স্যুট-টাই পরিধান করে আসতে হবে। শায়খ হাসান তাকে বললেন, আমি এসব পরিধান করব না। কুফফারের পোশাক আমি গায়ে জড়াবো না। মন্ত্রী তাঁকে বলল, আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজদের এই বেশভূষা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। তিনি তখন মন্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, হাসানুল বান্না তাতে ইসলামি পোশাক ছেড়ে প্রবেশ করবে না।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী এবং এই ছাত্রের মাঝে রীতিমতো এক বিতর্ক হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত মন্ত্রীকে মেনে নিতেই হলো। কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র। শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে পুরস্কার দিতে বাধ্য হলেন। তিনি পুরস্কার গ্রহণ করতে পাগড়ি এবং জুব্বা নিয়ে প্রবেশ করলেন, যা তাঁর পরিধানে ছিল। তাকে মন্ত্রী পুরস্কারও দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে পুরস্কৃত না করেই-বা কী উপায়! এরপর তিনি ইসমাঈলিয়্যাতে চলে যান। তিনি ছিলেন ইসমাঈলিয়্যার প্রাথমিক উস্তাদ।

ইসমাঈলিয়্যা ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত একটি শহর। সেখানকার সব মানুষ তখন সুয়েজ খাল কোম্পানির কর্মচারী ছিল। সুয়েজ খাল কোম্পানি ছিল ইংরেজদের। মানুষ হয়েও কেমন যেন তারা ছিল পশুর মতো; পানাহার করে আর গাধার মত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। দিনের বেলা এরা গাধা, আর রাতের বেলা মৃত ও নিথর দেহ।

[আল্লাহ এমন নির্বোধদের অপছন্দ করেন, যারা দিনের বেলা গাধার মতো খাটুনি খাটে আর রাতভর নিথর দেহে বিছানায় পড়ে থাকে। পার্থিব বিষয়ে তারা বড় পারঙ্গম, তবে পরকালীন বিষয়ে নিরেট অজ্ঞ।]

এভাবে তারা সারাটি দিন গাধার মতো কাজ করে কাটাতো, আর রাতের বেলা নিজেদের মাথাটি পশুর বিচালিতে রেখে ঘুমাত।

শায়খ হাসান আল বান্না রহ. এই পরিস্থিতি দেখলেন। মসজিদে এই শ্রেণির লোকদের কাউকেই কখনো দেখা যেত না। তিনি ওয়াজ-নসিহত করার জন্য মসজিদে যেতেন। তখন যুবকশ্রেণির কাউকেই সেখানে খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্ধ, কর্মক্ষম এবং অশীতিপর বৃদ্ধদেরই কেবল সেখানে পাওয়া যেত। মসজিদে এসে তারা বসে বসে নামাজ আদায় করত। নামাজ শেষে চা-কফির দোকানপাটে চলে যেত। সেখানকার মানুষগুলোর রুটিনই এমন ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টুকু তারা কোম্পানির কাজে ব্যস্ত থাকত। এরপর আসরের পর থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত সময়টুকু এভাবে চা-কফির দোকানপাটে কাটিয়ে দিত। সেখানে বসে তারা তাস খেলত আর একটু পরপর কফির ধূমায়িত কাপে চুমুক দিত।

হাসান আল বান্না রহ. চা-কফির এসব স্টলে যাতায়াত শুরু করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদের পাশে বসতেন। কখনো-বা এক কাপ কফি নিয়ে পান করতেন। এরপর আবার চুপ করে বসে থাকতেন। অন্যরা তখন তাস খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তিনি তাদের মানসিকতা বুঝে ফেললেন। তিনি অনুধাবন করলেন, তারা গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। একদিন তিনি তাদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, তোমরা কী বলো? আমি তোমাদের জীর্ণ কলসীর গল্প বলতে চাই। তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এরপর জিজ্ঞেস-ই করে ফেলল, এ আবার কী গল্প? আচ্ছা, বলেই ফেলো। শুনেই দেখি। তিনি তাদের গল্প বলতে শুরু করলেন। আবু যায়েদের গল্প, নেকড়ের গল্প, জীর্ণ কলসীর গল্প, এ ধরনের প্রাচীন সব গল্প। গল্প বলতে বলতে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে আসে। গল্পের খুবই আকর্ষণীয় কোনো বাঁকে এসে তিনি তাদের কাছে অনুমতি চেয়ে বসেন, আচ্ছা, আপনারা যদি একটু সুযোগ দেন তাহলে আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করে আসি। তারাও একপ্রকার

অনন্যোপায় হয়ে উত্তর দেয়, জি অবশ্যই। আপনি যান। নামাজ পড়ে আসুন। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করি। এভাবে তিনি তাদের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে নামাজে চলে আসেন। আর তারা বসে বসে গল্পের চরিত্র নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে ভাবতে থাকে, এরপর কী হলো! এরপর কী হলো!!

এভাবে একদিন, দুই দিন, দশ দিন পার হলো। তারাও ভাবতে লাগল, আমরা কেন এভাবে তার অপেক্ষায় বসে থাকছি? কেন তার সঙ্গে নামাজ পড়তে যাচ্ছি না? নামাজ পড়ে এসে তো গল্প শোনা শেষ করা যাবে! এবার তারা এই চায়ের আসর থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া শুরু করল। দাওয়াতের এই প্রবাদ পুরুষ তাদের চায়ের আসর থেকে তুলে মসজিদে নিয়ে গেলেন।

ওই তো ইউসুফ তালায়াত এবং তার সঙ্গী আরও কয়েকজন, যারা কিনা ছিলেন সাইকেলের ম্যাকানিক। দিনপ্রতি তাদের উপার্জনই ছিল মাত্র তিন'শ টাকার মতো। শেষ পর্যন্ত কী হলো? তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সুয়েজ খাল যুদ্ধের কমাণ্ডার ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অথচ তিনি সাইকেল মেরামত করে উপার্জনকারী এক ব্যক্তি।

যখন মসজিদে আগত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তিনি মসজিদে তাদের দরস বা পাঠদান করতে শুরু করলেন। মসজিদের ইমাম ভাবতে শুরু করলেন যে, এই লোক তো এখানে এসে তার কর্তৃত্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করছে। নামাজি দিয়ে মসজিদ ভরে যাচ্ছে। মুসল্লিও আর কেউ নয়; সেই সুয়েজ খালের কর্মচারী যুবকরাই, যারা তখন তাদের জীবনের উন্মেষকাল অতিক্রম করছিল। বিষয়টি ইমাম সাহেবকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। তিনি এতে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, শায়খ হাসান মুসল্লি দিয়ে মসজিদ পূর্ণ করে তুলছেন। এতে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তাকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করলেন, তাঁর ব্যাপারে নানা প্রশ্ন-আপত্তি তুলতে লাগলেন। অপরদিকে শায়খ হাসান আগত যুবকদের নবিগণের সবর-ধৈর্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ শোনাতেন। একবার তিনি তাদের ইবরাহিম ﷺ-এর ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। মসজিদের যে শায়খ

নিজ আধিপত্য কিংবা বলা চলে প্রজাতন্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তিনি তার আঙুল তুললেন এবং শায়খ হাসান রহ-কে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করে বসলেন, 'ইবরাহিম ﷺ-এর বাবার নাম কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মুফাসসির আলিমগণ এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। কোনো কোনো মুফাসসির আলিম বলেছেন, "তাঁর বাবার নাম আযর।" কেউ-বা বলেছেন, "তার বাবার নাম ছিল তারুখ।" এবার ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'তারুখ! এ লোক আবার কে?' এককথায় ইমাম সাহেব এ কথা প্রমাণ করতে যারপরনাই সচেষ্ট ছিলেন যে, শায়খ হাসানের কাছে ভুল তথ্য রয়েছে।

শায়খ হাসান ভাবলেন, এই শায়খ থেকে যেভাবে হোক মুক্তি পেতে হবে। তবে বাহ্যত তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় তো দেখছি না। তাই এ পরিস্থিতিতে সবচে' ভাল মনে হচ্ছে, তাকে বাড়িতে দাওয়াত করে আনা। যেই ভাবা সেই কাজ। শায়খ হাসান ইমাম সাহেবকে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করলেন। তার মেহমানদারির জন্য জবরদস্ত আয়োজন করলেন। এরপর একদিন রাতে এনে শানদার মেহমানদারি করলেন। প্রথমে তার সামনে চর্বিযুক্ত গোশত পরিবেশন করলেন। গোশত দিয়ে মূল আহার শেষ করার পর দস্তরখানে ফল এল। তিনি তৃপ্তিভরে ফল খেলেন।

এরপর শায়খ হাসান তাকে নিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে পা বাড়ালেন। সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে তাকে উপহার দিলেন এবং বললেন, হে শায়খ! আমার পক্ষ থেকে আপনাকে এই সামান্য উপহার। শায়খ হাসান বলেন, এই ঘটনার পর আলহামদুলিল্লাহ সে সমস্যার অবসান হয়। মূলকথা হলো, কখনো এক ব্যক্তি একাই মসজিদে জেরার হতে পারে।

আমি ফিলিস্তিনে কখনো কোনো মেয়েকে বড় চাদর পরিধান করতে দেখিনি কখনো! [এ কথা আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগের] কোনো ছাত্রীর ব্যাপারে এমনটা তো ভাবাই যায় না! যদি কোনো শিক্ষিকাকে দেখতাম, সে তার পেছনের অর্ধেক চুল রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখেছে, তবে তার ব্যাপারটি নিয়ে আমরা একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতাম এবং বলতাম, এ হচ্ছে আমাদের দেখা সবচেয়ে উত্তম শিক্ষিকা!

কেন? কারণ, তিনি তার অর্ধেক চুল রুমাল বা ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। যদি তিনি এর সাথে মোজা পরিধান করতেন, তবে তো তা বিরাট ব্যাপার! তিনি বড় ওলি-দরবেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যেতেন। হাঁ, এমন দৃশ্য চোখে পড়া সম্ভব-ই ছিল না।

আমি আপনাদের আমার এক শিক্ষকের গল্প শোনাতে পারি। তিনি আমাদের তারবিয়াত করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমাদের সেই শিক্ষক তার এক ভাতিজিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠালেন। তার গায়ের শেমিজটি ছিল কিছুটা লম্বা, যার দৈর্ঘ্য ছিল হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালির মধ্যভাগ পর্যন্ত। সেখানে শেমিজ পরিধানের নিয়ম ছিল, তার দৈর্ঘ্য হতে পারবে সর্বোচ্চ হাঁটু পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রীরা সাধারণত মোজা পরিধান করতো না। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষক তার ভাতিজির শেমিজটি রেখেছিলেন দীর্ঘ, আবার তার হাত-পায়ে পরিধান করাতেন মোজা। এসব কারণে সে বিদ্যালয়ের সবার হাসির পাত্রে পরিণত হলো। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তাকে বের করে দিত। এই শুয়োর মহিলা তাকে সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করত! কেন? কারণ, সে লম্বা জামা পরিধান করেছে।

এমতাবস্থায় আমাদের সে শিক্ষক মহোদয় তাকে শাসিয়ে বললেন, আমি বিষয়টি বিচারালয়ে তুলব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গের কাছে বিচার দায়ের করব। এ কথা শোনার পরই কেবল সেই প্রধান শিক্ষিকা কিছুটা চিন্তিত হলো এবং ভাবল, আখের যদি এতে জটিলতা সৃষ্টি হয়! তাই বোধ হয় এমন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম হবে। নইলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হতে পারে। সে এবার সেই ছাত্রীকে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার পোশাককে আমরা না হয় মেনেই নিলাম।

আজ আপনারা বড় নিয়ামত ভোগ করছেন। আরবদ্বীপ কখনো সেই অবক্ষয় এবং অধঃপতন প্রত্যক্ষ করেনি; যা কিনা কুয়েত সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে। হাসান আইয়ুব আসার পূর্বে কুয়েত আশ্চর্যজনক এক দুরাবস্থার মধ্যে সময় অতিক্রম করেছে। যাকে আবর্জনার স্তুপের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বাস্তবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুয়েত তখন জাহিলিয়াতের অথৈ সমুদ্রে

ডুবেছিল। কুয়েতের মেয়েরা তখন হাঁটু বরাবর কিংবা হাঁটুর ওপর পোশাক পরিধান করত। তারা এটাকে আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করত। নির্লজ্জ জাহিলিয়াতকে তারা আধুনিকতা নামে নামকরণ করেছিল। তারা বলত, আমার কাছে এক ধরনের জওয়াব আছে; অর্থাৎ, অর্ধেক জওয়াব।

সবচে' দুশ্চিন্তার বিষয় এটাই ছিল যে, কুয়েতের মেয়েরা হাঁটুর ওপরও পোশাক পরিধান করত। এরপর শায়খ হাসান আইয়ুবের আগমন ঘটল। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি পুলিশের ব্যাটালিয়ন নিযুক্ত করলেন। ঘরে ঘরে পুলিশি নজরদারি চলল। তিনি মসজিদভিত্তিক জনসচেতনতা সৃষ্টিরও প্রয়াস গ্রহণ করলেন। তখন ক্রমান্বয়ে লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করল। ঘরবাড়িতে হিদায়াতের প্রদীপ জ্বলে উঠতে শুরু করল। আর এভাবে সমাজের মোড় পরিবর্তন হল। এরপর যখন সেখানে ইসলামের সুন্দর আবহ তৈরি হলো, কুয়েতের মানুষেরা বলতে শুরু করল, 'হে হাসান আইয়ুব, আল্লাহ তোমার সবকিছু সহজ করে দিন, তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট!'

এরপর তিনি সৌদিতে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মব্যস্ত হলেন। জিদ্দাবাসীর প্রতি দীনি মেহনত শুরু করলেন। জিদ্দার যুবসমাজের চারিত্রিক অবস্থা ছিল সকরুণ। তাদের অধিকাংশই উচ্ছন্নে গিয়েছিল। তারা অহর্নিশ গার্লফ্রেন্ড সঙ্গে করে গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দিনভর তাদের নিয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াত। মার্কেটে মার্কেটে ফষ্টিনষ্টি করত। যাদের মূলত কোনো কাজ ছিল না। তারা ছিল বেকার। তাদের কাজই ছিল, দিনভর অশ্লীল কুকর্মের প্ল্যান আঁকা, প্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা এবং পাশবিক উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করা। শায়খ হাসান আইয়ুবের মাধ্যমে তারা দীনের পথে ফিরে আসতে শুরু করল। হাজারো যুবক জীবনের গতিপথ পাল্টিয়ে মসজিদমুখী হলো। মসজিগুলোতে এখন আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মসজিদগুলোকে প্রশস্ত করল। দেখা গেল, তারপরও স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। অবশেষে মসজিদগুলোকে আরও বিস্তৃত করা হলো। জিদ্দার হাজারো অধিবাসী— যারা কিনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রভৃতি—তারা শায়খ হাসান আইয়ুবের মসজিদে আসতে শুরু করল।

সে সময়ে কিছু বক্রস্বভাবের লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, 'তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছু একটা করো। কুয়েতের লোকেরা তাকে যেভাবে দেশছাড়া করেছে, তোমরাও জিদ্দা থেকে সেভাবে তাকে বহিষ্কৃত করো।'

এক শায়খ—যিনি কিনা একজন দায়ী ছিলেন, মানুষদের সৎকাজের আদেশ করতেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতেন—তিনি বললেন, হাসান আইয়ুবের মসজিদই কেন মুসল্লিতে ভরপুর হয়ে যায়, অথচ আমাদের কাছে কেন একজন মানুষও আসে না! আল্লাহর কসম, সে কিছুতেই এ দেশে থাকতে পারবে না! ভাবা যায়, কীভাবে একজন শায়খ এমন জঘন্য কথার ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছেন! এ শায়খ তো নিজেই তো একটি মসজিদে জেরার, আস্ত মসজিদে জেরার!

এর পরের অবস্থা আরও গুরুতর। তারা তার পুরোনো বইপত্র ঘাটাঘাটি শুরু করল এবং অবশেষে ইসলামি আকিদাসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে একটি বাক্য, এবং তাতে মাত্র দুটো শব্দ খুঁজে পেল। তারা এটাকে পুঁজি করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। তারা এটাকে নিয়ে শায়খ আবদুল আজিজের শরণাপন্ন হলো। তাকে গিয়ে জানাল, 'হে শায়খ, এই যে হাসান আইয়ুব, তার আকিদা গলদ, ভ্রান্ত!' শায়খ তখন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছেন আপনারা? কীভাবে তার আকিদা গলদ, ভ্রান্ত? তারা তখন তার বই খুলে সেই বাক্যটি প্রদর্শন করল।

পত্রপত্রিকায় হাসান আইয়ুবের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু হল। তাদের একজনের নাম আবু তুরাব জাহেরি। একজনের নাম আবু তুরাব বাতেনি। তারা তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করল। আবু তুরাব জাহেরি হাসান আইয়ুবের আকিদা নিয়ে লিখতে শুরু করল! ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন তো?

প্রচার করা হলো হাসান আইয়ুবের আকিদা ভ্রান্তিকর। হাসান আইয়ুব একদিন তাদের দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। এরপর তাদের উদ্দেশে বললেন, 'হে মান্যবর ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের অভিনন্দন! আচ্ছা, বলুন তো, আমার কাছে আপনাদের জন্য কী রয়েছে? আপনারা আমার কাছে কী চান? আমার আকিদা ভ্রান্তিকর? আমি তা আপনাদের হাতেই বিশুদ্ধ করে নিতে

চাই! আমি আপনাদের হাতেই আল্লাহর কাছে তাওবা করতে চাই। আচ্ছা, আমাকে বলুন, আমার কী ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে?'

তারা বলল, 'এই যে বই! এখানেই তো আপনার ভ্রান্তিকর আকিদার উল্লেখ রয়েছে!' বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর তারা মুখস্থই করে রেখেছিল। তিনি তাদের বললেন, আপনারা এই বইটি রাখুন। এর ভেতরে যা কিছু আছে, সব মুছে ফেলুন। এরপর বিষয়গুলো শুধরে নিয়ে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিন এবং এভাবে নতুন করে এর সংস্করণ করুন। নতুন এবং সহিহ আকিদাগুলো আপনারা যেভাবে চান লিখে দিয়ে তাতে আমার নাম যোগ করে দিন। আমি এতে কোনোই দ্বিমত করব না। বলুন, এ ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? তারা বলল, 'ঠিক আছে, আমরা একমত হলাম, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।' এক সপ্তাহ কিংবা দু-সপ্তাহ পর পত্রিকাগুলো আবারও হাসান আইয়ুবের আকিদার বিচ্যুতি নিয়ে লিখতে শুরু করল! অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও হাসান আইয়ুবকে বের করে দিলেন। মিশরের নাগরিকত্ব বাতিল করে হাসান আইয়ুবকে জামেয়া থেকে বের করে দেওয়া হল! কারণ কী? কারণ, তার আকিদা-বিশ্বাস গলদ! কারণ, তার আকিদা-বিশ্বাস ভ্রান্তিকর! মসজিদে জেরারের ধারা চিরকালই থাকবে!

হাসান আইয়ুব মিশর থেকে ফিরে এলেন। তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল রমজানে। বড় বড় মসজিদের দায়িত্বশীল কয়েকজন ভালো মনের মানুষ নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তারা কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন জানালেন, আমাদের জন্য শায়খ হাসান আইয়ুবের নাগরিকত্ব বাতিল করা উচিত হচ্ছে না। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো মিশরে গেলেন। এরপর তিনি যখন ফিরে আসলেন, তার কিছুদিন পরে পুনরায় তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হলো। সুতরাং বাধ্যতামূলকভাবেই তাকে তার ইকামা হস্তান্তর করতে হবে। তাঁকে সৌদি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তাঁর বাসভবন জামেয়ার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। তাঁর ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে! সন্তানদের এমন অবস্থায় রেখেই তাকে এখন সব ত্যাগ করতে হবে।

তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তবে আপনারা এ উত্তরটি দিন, আমি যাওয়ার পূর্বে আমাকে অবহিত করলেন না কেন? এভাবেই কি আমার থেকে শোধ নিলেন? এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ নাসিফ এখানে-সেখানে বিভিন্ন মন্ত্রী-নেতাদের পেছনে অবিরাম দৌড়ঝাঁপ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কিছু সৎ এবং ভালো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। তিনি তাদের কাছে এ মর্মে আবেদন জানালেন যে, হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আপনারা তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করছেন, এটা না হয় ঠিক আছে। কিন্তু তাকে অন্তত কোনো মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিন।

সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক শায়খ হাসান আইয়ুব মসজিদের একজন ইমাম হয়ে থাকলেন। পাশাপাশি একটি দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করতে শুরু করলেন। দাওয়াতি একটি প্রতিষ্ঠান; যার ছাত্র সংখ্যা সর্বোচ্চ ষাট বা সত্তরজন হবে।। যাদের হাতে পাঠ গ্রহণ ব্যতীত হয়তো আর কোনো কাজই নেই। তারা তো কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো হবে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা হয়ে থাকে দেশের মেধাবী সন্তান, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। দেশবাসীর মধ্য থেকে উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও সবিশেষ মর্যাদাবোধসম্পন্ন সচেতন শ্রেণি। অদূর ভবিষ্যতে দেশের পরিচালনার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত হবে। শায়খ হাসান আইয়ুবের মতো একজন যোগ্য ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এমন একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে! কেন? কারণ, তার আকিদা গলদ, বিভ্রান্তিকর! অথচ তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি কুয়েত থেকে জিদ্দা পর্যন্ত আকিদা বিশুদ্ধ করে বেড়ালেন। হাজার হাজার যুবক এই হাসান আইয়ুবের মাধ্যমেই মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে এসেছে, সরল পথে উঠে এসেছে!

সুতরাং মসজিদে জিরার শেষ হয়ে যায়নি। এর কারণ কী? কারণ তো খুব স্পষ্ট। জ্ঞাতি ভাইদের হিংসাবৃত্তি! 'মানুষেরা কেন হাসান আইয়ুবের কাছে যায়? কেন তারা আমাদের মজলিসগুলোতে আসে না?' 'আল্লাহর কসম, সে এ দেশে কোনোক্রমেই থাকতে পারবে না!'

তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার পর দিনকয়েকের মধ্যেই একজন সৎ এবং মহান ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ নাসিফ অক্লান্ত চেষ্টা-পরিশ্রমের পর শাইখ হাসান আইয়ুবকে রাবেতায়ে আলমি ইসলামির দাওয়া বিভাগের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করতে সক্ষম হলেন। তিনি প্রতিবছর ইসলামি বিশ্বের এমন ৩১জন ছাত্রকে সেই বিভাগে ভর্তি নিতেন, যারা কিনা কোনো কারণবশত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি।

সুতরাং মসজিদে জিরার অসংখ্য, অগণিত। অপরদিকে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, 'ক্ষতি করতে নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতেও নেই।' অর্থাৎ এমন কাজ করতে নেই, যেখানে তোমার কোনো লাভ রয়েছে ঠিক, তবে তাতে তোমার মুসলিম ভাইয়ের কোনো ক্ষতি রয়েছে। এমন কাজ সম্পূর্ণ হারাম। একইভাবে এমন কাজও করতে নেই, যেখানে না তোমার লাভ বা কল্যাণ রয়েছে আর না তোমার মুসলিম ভাইয়ের কোনো লাভ রয়েছে। এমনিভাবে যে কাজে তোমার কোনো লাভ নেই, অথচ তাতে তোমার ভাইয়ের কোনো ক্ষতি রয়েছে। এ সবই 'জিরার'।

এ কারণেই যদি আপনি আপনার বাড়িতে ময়লা পানির কোনো পাইপ আপনার প্রতিবেশীর দরজা বরাবর লাগিয়ে থাকেন তাহলে আপনার জরুরি হচ্ছে, তা বন্ধ করে দেওয়া। কারণ, এতে করে আপনার প্রতিবেশীর ক্ষতি হচ্ছে। অনুরূপভাবে আপনি যদি কোনো জায়গায় এমন চুলা নির্মাণ করবেন, যার ধোঁয়ার কারণে মানুষের কষ্ট হয়, তবে এমতাবস্থায় আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, তা বন্ধ করে দেওয়া। কারণ, 'ক্ষতি করতে নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতেও নেই।' কারও ক্ষতি করা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। এমনকি এই অধিকারও আপনার নেই যে, আপনি আপনার মালিকানাধীন বিষয়েও এমনভাবে হস্তক্ষেপ করবেন, যা পরিণতিতে অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যদিও মৌলিকভাবে কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ না হয়। তাই কোনো কোনো অবস্থায় আপনার জন্য নিজ দোকানে থাকা পণ্যের মূল্যহ্রাসও বৈধ হবে না। এটা তখন, যখন এই মূল্যহ্রাসের দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য হবে পার্শ্ববর্তী দোকানদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। যেমন ধরুন- আপনি যদি কোনো কাপড়ের কোম্পানির মালিক হন, আর আপনার কোম্পানির পাশেই কোনো

দরিদ্র দোকানদারের ছোট পরিসরের কাপড়ের দোকান থাকে, এমতাবস্থায় আপনি যদি আপনার পণ্যের মূল্য সপ্তাহখানেকের জন্য কমিয়ে দেন, তবে এতে করে আপনার প্রতিবেশী দোকানদারের ব্যবসার মৌলিক কাঠামোই ভেঙে পড়বে। সে তার দোকানের দরজায় তালা লাগিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হবে। এমনটি করা সম্পূর্ণ হারাম। 'ক্ষতি করতে নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতেও নেই।' এমনকি এই মূল্য কমানোর কারণে মুসলমানদের কোনো উপকার হলেও তা অবৈধই থেকে যাবে; যেহেতু এই মূল্য কমানোর পেছনে পার্শ্ববর্তী দোকানদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যও লুকায়িত রয়েছে।

আপনি যদি আপনার জমিতে কোনো কূপ নির্মাণ করেন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার প্রতিবেশীর কূপ থেকে পানি টেনে আনে, তবে এটাও বৈধ হবে না। কারণ, এতে করে আপনার প্রতিবেশীর ক্ষতি হচ্ছে। আপনি যদি আপনার ঘরে কোনো ছোট্ট জানালা কাটেন, যা দিয়ে প্রতিবেশী মহিলাদের দিকে নজর দেওয়ার পথ খোলে, তবে এ কাজটিও আপনার জন্য বৈধ নয়। এমন জানালা আপনাকে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে; যদিও এর মাধ্যমে আপনার স্বাধীনতাকে শ্বাসরুদ্ধ করা হচ্ছে, আপনার ঘরে বাতাস কিছুটা কম প্রবেশ করছে। কারণ, মানুষের আব্রু উন্মোচন আল্লাহ তাআলার নিকট নির্মল ও অনাবিল বাতাস উপভোগ করার চেয়ে অনেক বেশি জঘন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে!

'ক্ষতি করতে নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতেও নেই।' অথচ পশ্চিমা বিশ্ব দাঁড়িয়েই আছে অন্যদের ক্ষতি করার চেতনার ওপর। তারা টিকেই আছে বড় ভিতের ওপর ভর করে। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকেই আছে ধ্বংস, বিপর্যয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার যত ভিত্তিমূল রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ দুটো ভিত্তিমূলের ওপর। একটা ভিত্তির নাম হলো সুদ আর অপর ভিত্তির নাম হলো সিন্ডিকেট বা মূল্যবৃদ্ধির জন্য মজুদদারি। সিন্ডিকেট অর্থাৎ, চিনির ব্যবসা অমুক কোম্পানির সঙ্গে বিশেষিত। স্বর্ণের ব্যবসা অমুক কোম্পানির জন্য নির্ধারিত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি স্বর্ণের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দোকান খুলে বসে তাহলে তারাই তাকে প্রতিহত করবে, নিজেদের পণ্যের মূল্য হ্রাস করে দেবে, ফলে লোকটি দুদিনেই দমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির দিকে পথ ধরবে। তাদের অর্থনীতি পুরোটাই এই সিন্ডিকেট

এবং সুদের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে; বরং বাস্তবতা হলো পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরচেয়েও ভয়ঙ্কর নীতির ওপর দণ্ডায়মান; যার কারণে পণ্যের মূল্য সবসময় উর্ধ্বগতি থাকে। তারা আমেরিকার চাল এবং গম, ব্রাজিলের কফি সাগরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয় আর অল্প পরিমাণ বাকি রেখে দেয়; যার ফলস্বরূপ তারা এসব পণ্যকে ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করে বেড়ায়। আফ্রিকা আর সুদানসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অথচ আমেরিকা তাদের হাজার টন গম সাগরে নিক্ষেপ করছে। ফলে আমেরিকার গম তার কোয়ালিটি ধরে রাখছে এবং উচ্চ মূল্যে বহাল থাকছে!

পাশ্চাত্য এমন এক সমাজ, যে সমাজের ভিত্তিই অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করার মূলনীতির ওপর। সেই সমাজে মানুষের কোনো মূল্য নেই। এ জন্য আপনি দেখবেন, পাশ্চাত্যে কুকুররা বাবা-মা'র চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে। উভয় শ্রেণির মধ্যে অগ্রাধিকার কুকুরের জন্যই বরাদ্দ থাকে। এই আমেরিকান জনগোষ্ঠী তাদের কুকুরকে নিজ হাতে গোসল করায়। কুকুর সর্বদা তাদের সঙ্গেই থাকে, কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কুকুর যদি অসুস্থ হয় পড়ে তবে তারা ভীষণরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রচণ্ডরকম অস্থির থাকে। আর যদি মারা যায়, তবে সে তার জন্য দিবস পালন করে। তেমনিভাবে সেখানে স্যুপের দোকানগুলোতে বেড়াল-কুকুরের জন্য বিশেষ খাবার আছে, এদের জন্য বিশেষ ডাক্তার আছে, হোটেলে রাখার জন্য বিশেষ কামরা আছে, যেখানে তাদের যাবতীয় সুবিধা দেওয়া আছে। অর্থাৎ, সেখানে কুকুরও এমন সব সুবিধা পায়, যা মানুষ পায় না। তাদের অনেকে তো কুকুরের জন্য উত্তরাধিকারের অসিয়তও করে যায়। কৃপণের সম্পদ তো ইবলিসের জন্যই।

আমি বলবো পাশ্চাত্য সমাজ হচ্ছে অপরকে ক্ষতি করার এবং নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমাজ। পাশ্চাত্য সমাজ হচ্ছে, মসজিদে জিরারের সমাজ। ['যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতি সাধন করবে, কুফরি কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।'] সেই সমাজে আপনি এমন মহিলাও পাবেন, যে তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয় শুধু এ কারণে যে, তার স্বামীর ঘুমের ঘোরে নাক ডাকে। আর সেই নাক

ডাকার আওয়াজে তার কুকুরের কষ্ট হয়। বুঝতে পারছেন? তার স্বামী নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, এতে তার কুকুর অস্থির হচ্ছে, কুকুরের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কুকুরের অস্থির হওয়া বা ঘুম ভেঙে যাওয়া তো হারাম! সুতরাং তার ওপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্বামীকে ত্যাগ করা আর শখের কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রঙিন জীবনের স্বপ্ন আঁকা।

আপনি ইউরোপে অসংখ্য পশুপ্রেমী সংস্থা-সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন, অথচ আফ্রিকায় হাজার হাজার মুসলমানকে জবাই করা হচ্ছে। কারা জবাই করছে? ঠিক সেই মানুষগুলোই, যারা কিনা পশুপ্রেমী সংস্থা-সংগঠনগুলোর সদস্য! আপনি লক্ষ্য করবেন, কোনো ইউরিপিয়ান নাগরিক যদি কোনো গাধার পিঠে ভারি বোঝা বহন করায়, তবে তার এই কাজের প্রতিবাদে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে, পত্রিকাগুলো এই অমানবিক কাজের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। অথচ উগান্ডা-ইরিত্রিয়াসহ অনেক রাষ্ট্রে হাজার হাজার মানুষকে প্রতিনিয়ত নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলমানের রক্তে পৃথিবীর মানচিত্র লাল হয়ে উঠছে। অথচ এ ব্যাপারে কাউকে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে দেখা যায় না।

এ কারণেই ১৯৫৪ সালে স্বৈরসাশক আবদুন নাসেরের হাতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের ঘটনাকে কেন্দ্র করে (আমার যতদূর মনে পড়ছে) ফিলিস্তিনের বড় শহর নাবুলসের মুফতি সাহেব পশুপ্রেমী সংস্থার লোকদের উদ্দেশ্য করে এ মর্মে পত্র পাঠিয়েছিলেন যে, ‘আমি আশা করব, তোমরা মিশরে এই এজেণ্ডা নিয়ে অনুপ্রবেশ করবে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের সঙ্গে তোমরা শুধু পশুর মতো আচরণ করবে। পশু তো তোমরাই চড়াও। তোমরা তাদেরও পশু হিসেবে বিবেচনা করবে এবং এই বিবেচনাবোধ থেকে তাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করবে।’

আপনি দেখবেন, পথ চলতে গিয়ে কোনো ক্ষুধার্ত কুকুর বা পিপাসার্ত গাধা যদি কোনো ইংরেজের নজরে পড়ে তাহলে সে আদালতে সেই কুকুর বা গাধার মালিকের বিরুদ্ধে অনাদরের অভিযোগ দায়ের করে। অপরদিকে সে ইংরেজ ব্যক্তিটিই আবার ফিলিস্তিনে শুটিং প্র্যাকটিসের জন্য একঝাঁক মুসলিম

যুবকদের মাথা টার্গেট করে; যে যুবকদের বয়স বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে। মুসলিম যুবকের মাথা হয় তাদের শুটিং প্র্যাকটিসের লক্ষ্যস্থল।

ইংরেজদের বিবেক এবং মানসিকতার সঙ্গে এটাই অবশ্য সুসামঞ্জস্য। তাদের মানসিকতাই হলো প্রভুর বন্দেগি করা। আর সকলের ওপর তাদের প্রভু হলো মহান বৃটেন, আমেরিকা অথবা জার্মানি কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো মূর্তি, যাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশ্বের বুকে জগতসমূহের প্রতিপালকের স্থলবর্তী হয়ে কর্তৃত্ব করার জন্য।

'আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা (মুসলিমদের) ক্ষতি সাধন করবে, কুফরি কথাবার্তা বলবে, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।' যে কেউ বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো কাজ করবে বা কোনো দল গঠন করবে, এটাও সেই মসজিদে জিরারের মতোই হবে।

আমি আফগানিস্তানের অনেক জিহাদি গ্রুপকে আফগান জিহাদের মসজিদে জিরার নামে নামকরণ করে থাকি। কারণ, তারা মুমিনদের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই কাজ করছে। মুমিনদের ক্ষতির জন্য যেকোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা-ই মসজিদে জিরার হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সে সকল মসজিদে জিরারকে সমূলে উৎপাটিত করা একান্ত আবশ্যক। নবি করিম ﷺ চার সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়ে মসজিদে জিরারকে ধ্বসিয়ে দেন, তাতে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ মসজিদ জ্বালিয়ে দেন। নবিজি সেই স্থানটিকে আবর্জনার ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেন। মসজিদ পরিণত হলো ময়লা ফেলার স্থানে। এরপর নবিজি ﷺ কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আর সেখানে দাঁড়াননি। মসজিদে জিরারের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে চলাচল করাটাও অনুচিত। যে ইমাম সেই মসজিদে জিরারে নামাজ পড়াতেন, সাহাবিগণ তাকে নিয়ে উমর ﵁-এর কাছে এলেন। তারা আমিরুল মুমিনিন বরাবর এই দাবি পেশ করলেন যে, ইবনে আমর ইবনে আওফকে যেন মসজিদে কুবার ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। মসজিদে কুবা হলো সেই মসজিদ, যা মদিনায় সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছে। লোকেরা উমর ﵁-এর কাছে এলে তিনি বললেন, না, এটা কীভাবে সম্ভব! মসজিদে কুবার ইমাম হওয়া তো বড় নিয়ামত এবং বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার! তোমরা,

যাকে নিয়ে এসেছ, সে কি মসজিদে জিরারের ইমাম ছিল না? তার নাম মাজমা ইবনে জারিয়া। সে তো মসজিদে জিরারের ইমাম ছিল।

উমর ﷺ তার শাসনামলে এই ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন মাজমা ইবনে জারিয়া বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, দয়া করে আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করবেন না! আল্লাহর কসম, আমি সে মসজিদে নামাজ পড়িয়েছি, তা শুধু এ কারণে যে, সে মসজিদের প্রতিষ্ঠাকারীদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি যদি তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম তাহলে কিছুতেই সেখানে তাদের নামাজের ইমামতি করতাম না। আমি ছোট ছিলাম, কুরআন ভালো পড়তে পারতাম। অপরদিকে সেই মসজিদের নির্মাতারা ছিল বয়স্ক, যারা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছে জাহিলিয়্যাতের ওপর, তারা কেউই কুরআন পড়তে পারত না। আমি যে সেখানে নামাজ পড়িয়েছি, আমি মনে করি না যে, এর কারণে আমি কোনো গুনাহ করেছি। কারণ, তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আমি মোটেও অবগত ছিলাম না। এ কথা শোনার পর উমর ﷺ তাকে মাজুর হিসেবে বিবেচনা করলেন। তিনি তার কথাকে সত্য হিসেবে মেনে নিলেন। আর তাকে মসজিদে কুবার ইমমতি করার অনুমতি প্রদান করলেন।

সুতরাং প্রত্যেক এমন বিষয়, যাতে অন্যের ক্ষতি রয়েছে এবং তা দ্বারা অন্যের ক্ষতি করাও উদ্দেশ্য, এমন সবকিছুই মসজিদে জিরারের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি মুমিনদের মাঝে একধরনের (বাহ্যিক) বিভক্তি দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে কোনো কোনো ইমাম; বিশেষ করে ইমাম মালিক রহ. এক মসজিদে দু-জামাতকে বৈধ মনে করেন না। প্রথম জামাত যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তিনি মনে করেন যে, সেখানে দ্বিতীয় জামাত করার অনুমতি নেই। আলোচ্যবিষয়ে হানাফি এবং শাফেয়ি আলিমগণের মতও এটাই। তবে হাম্বলি মাযহাবের আলিমগণ এক মসজিদে এক নামাজের একাধিক জামাত বৈধ মনে করেন।

'এবং পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলের সঙ্গে যে ব্যক্তির যুদ্ধ রয়েছে তার জন্য একটি ঘাঁটির ব্যবস্থা করবে।' আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশিত ব্যক্তি হলো

আবু আমের রাহেব। মদিনায় নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে তার একটা কথা হয়েছিল। সে দুআ করত, 'হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে কিনা ঐক্য বিনষ্ট করছে এবং জামাতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে তার ব্যাপারে আপনি ফায়সালা নিন।' এ ধরনের আরও অনেক দুয়া সে করত। পরিশেষে আল্লাহ তাকে ছিন্নমূল, বিতাড়িত এবং নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যু দান করেছেন। এরপর নবিজি ﷺ বলতেন, আল্লাহর কসম, সে নিজেই এমন দুআ করত। যার ফলে পরিশেষে ছিন্নমূল, বিতাড়িত এবং নিঃস্ব অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যু হয়েছিল রোমের কিনসারিন অঞ্চলে।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ.

'আপনি তাতে (অর্থাৎ তথাকথিত সেই মসজিদে) কখনো নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, সেটিই আপনার (নামাজের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ানোর অধিক উপযুক্ত।'

যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, তা নিরূপণে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, সে মসজিদটি হচ্ছে মসজিদে কুবা। আবার তাদের কেউ কেউ বলেন, সে মসজিদটি হচ্ছে নবিজির মসজিদ, যাকে মসজিদে নববি বলা হয়। অর্থাৎ মদিনার মসজিদ। আর প্রতিটি মতের পক্ষেই সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িগণের এক জামাআতের সমর্থন রয়েছে। যারা এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সেটি হচ্ছে মসজিদে কুবা; তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে আব্বাস ؓ, যাহ্হাক রহ., হাসান রহ. প্রমুখ। একইভাবে এই মতের পক্ষে আরও রয়েছেন ইবনে উমর ؓ, ইবনুল মুসাইয়িব রহ. এবং ইমাম মালিক রহ.-এর একটি মত। তাদের সকলের বক্তব্য হচ্ছে, মসজিদে কুবাই হচ্ছে সেই মসজিদ, যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে।

নবিজি মদিনায় পৌঁছার পর প্রথম আমর ইবনে আওফ গোত্রে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কোনো কোনো মুফাসসির এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল মসজিদে নববি নির্মিত হওয়ার আগেই; তবে

বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে—যা কিনা ইমাম তিরমিযি আবু সাঈদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন—দুজন ব্যক্তি যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, তা নিয়ে পরস্পরে মতভেদ করছিলেন। একজনের কথা ছিল, তা হচ্ছে মসজিদে কুবা। অপরজন বলছিলেন, তা হচ্ছে মসজিদে নববি। নবিজি ﷺ তখন বললেন, যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ওপর স্থাপিত হয়েছে, তা হচ্ছে আমার মসজিদ। অর্থাৎ মসজিদে নববি। আর এ হাদিসটা সহিহ হাদিস।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, প্রথম অভিমতটি কুরআনে বর্ণিত ঘটনার জন্য অধিক সামঞ্জস্য। কারণ কুরআনে বলা হচ্ছে—

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

'সেখানে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা অধিক মাত্রায় পবিত্রতা অর্জনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।' [সুরা তাওবা- ১০৮]

আর নবিজির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি জানি না, আমি বিশুদ্ধতা পরিমাণ দীন পৌঁছিয়েছি কি না। তিনি বলেন, হে কুবাবাসী! আচ্ছা এর কী কারণ, বলো তো দেখি। আল্লাহ নিজেই তোমাদের প্রশংসা করে বলছেন, 'সেখানে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যারা অধিক মাত্রায় পবিত্রতা অর্জনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।' তারা বললেন, আমরা শৌচকর্মে পাথর ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করে থাকি। পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা একটি মুস্তাহাব কাজ; ফরজ বা ওয়াজিব কিছু নয়। তাই আপনার কাছে যখন কোনো পাতা বা পাথর থাকবে, তা ব্যবহারই আপনার পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট হবে; যদিও আপনার কাছে পানি বিদ্যমান থাকে আর আপনি তা নাও ব্যবহার করেন। সুতরাং পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার দ্বারা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা মিটে যায়, তবে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম। তাই পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার একটি সুন্নত আমল। কারণ, শৌচকর্মে দুই গোপন অঙ্গ থেকে

নাপাকি দূর করা হচ্ছে উদ্দেশ্য। তবে পাথর দ্বারা নাপাকিকে হালকা করা হয়, দূর করা নয়। কারণ, পাথর ব্যবহার করার পরও কিছু নাপাকি থেকে থেকে যায়। আল্লাহ নবিজির কাজের মাধ্যমে আমাদের জন্য সহজ করে দিলেন এবং পানি থাকলেও পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ করে দিলেন।

সুতরাং যখন কেউ তিনটি পাথর বা শুকনো পাতা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করল এবং সে নিশ্চিত হলো যে, বাহ্যিক নাপাকি দূর হয়ে গিয়েছে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর এরপরও যদি পানি ব্যবহার করে, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং তা মুস্তাহাব হবে।

এমনকি ইমাম মালেক রহ. মনে করেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো কাপড় নিয়ে নামাজ আদায় করল, যাতে নাপাকি ছিল, আর সে যদি নামাজের সময় থাকতে দেখতে পায়, তবে সে নামাজের পুনরাবৃত্তি করে নেবে। আর যদি নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর দেখে তবে ইমাম মালিক রহ.-এর কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে, তাকে আর পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে না।

উদাহরণস্বরূপ- আপনি কোনো শৌচাগারে প্রবেশ করলেন, আপনার পরিহিত কাপড়টি ছিল দীর্ঘ, ফলে আপনার অজান্তেই তা গিয়ে নাপাকিতে ঠেকেছে, কিন্তু আপনি বিষয়টি টের পাননি। অনেক পরে দেখতে পেলেন যে, কাপড়ে কোনো নাপাকি লেগে আছে আর তা নিয়েই আপনি আসর এবং মাগরিবের নামাজ আদায় করে নিয়েছেন; তবে ফকিহগণের মতানুসারে এ ক্ষেত্রে আপনাকে আসর এবং মাগরিবের নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে; তবে ইমাম মালিক রহ.-এর মতানুসারে আপনাকে আসর এবং মাগরিবের নামাজের কোনোটিই আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইমাম মালিক রহ.-এর কোনো কোনো মতানুসারে অবশ্য শুধু মাগরিবের নামাজ পুনরায় আদায় করে নিতে হবে, যদি তখনও নামাজের সময় বাকি থাকে; এ ক্ষেত্রে ওয়াক্তের মধ্যে ওয়াক্তের ফরজ নামায আবার আদায় করবে। এ মতটি ইমাম মালিক রহ. এবং আরও কয়েকজন ফকিহ থেকে বর্ণিত।

আর হানাফি মাযহাবের আলিমগণ বলেন, নাপাকি যদি নাজাসাতে গালিজা হয়, তবে তা নিতম্বের বৃত্ত পরিমাণ পর্যন্ত ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ যদি তা দিরহামে বাগলি পরিমাণ হয়। আর দিরহামে বাগলি হয়ে থাকে স্বর্ণমুদ্রা পরিমাণ। এখানে তারা বিষয়টিকে পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ওপর কিয়াস করেছেন। অর্থাৎ শৌচকর্মের পর পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হলেও কিছু নাপাকি সেখানে থেকে যায়, পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন হয় না।

আর এ কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. বা হানাফি আলিমগণ বলেন, যদি আপনার কাপড়ের ওপর প্রস্রাবের ফোঁটা থাকে, যা দিরহামে বাগলি পরিমাণ অথবা হাতের তালু পরিমাণ নয়—তারা একে অনুমান করেছেন নিতম্বের বৃত্তের ওপর—তাহলে এমতাবস্থায় আপনার নামাজ বৈধ হবে। এতটুকু পরিমাণ রক্ত, প্রস্রাব এবং পায়খানা ক্ষমাযোগ্য। পায়খানা ক্ষমাযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে দিরহামের ওজন হিসেবে ধরা হবে আর প্রস্রাবের ক্ষেত্রে তার পরিধি লক্ষণীয় হবে। আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি আপনার কাপড়ে দিরহামের পরিধি পরিমাণ প্রস্রাব, পায়খানা বা রক্ত লেগে যায় তাহলে হানাফি আলিমগণের কথা অনুসারে তা ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আর শাফেয়ি ও হাম্বলি আলিমগণ বলেন, সামান্য পরিমাণ হলেও—যদিও তা প্রস্রাবের ফোঁটা পরিমাণই হোক না কেন—ক্ষমাযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই এমতাবস্থায় নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের ফতোয়া অনুসারে নামাজ আবার আদায় করে নিতে হবে; চাই তা ভুলে হোক কিংবা ইচ্ছাকৃত হোক; এর বিধান তার জ্ঞাত হোক কিংবা অজ্ঞাত হোক, তাকে অবশ্যই আবার নামাজ আদায় করে নিতে হবে।

শাফেয়ি এবং হাম্বলি আলিমগণ হানাফি আলিমগণের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদের দলিল খণ্ডন করেছেন। তারা বলেন, নিতম্বের বৃত্ত—যেখানে লেগে থাকা নাপাকি ক্ষমাযোগ্য—এর ওপর অনুমান করে সে পরিমাণ প্রস্রাবের ফোঁটা ক্ষমা করার বিষয়টি কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না। কারণ, তা জরুরত বা প্রয়োজনের খাতিরে ক্ষমা করা হয়েছে। আর এ

ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যে বিষয়টি যুক্তির বাহিরে থেকে বৈধতা দেওয়া হয়ে থাকে, তার ওপর অন্য কিছুকে অনুমান করা সঙ্গত হয় না। একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় তার প্রয়োজন অনুপাতে বৈধতা পায় এবং তার ওপর অন্য কিছুকে অনুমান করা যায় না। এ হচ্ছে শাফেয়ি এবং হাম্বলি মাযহাবের আলিমগণের পক্ষ থেকে খণ্ডন। তবে হানাফি আলিমগণ তাদের যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছেন। অবশ্য তাদেরও যুক্তি রয়েছে এবং পূর্বসুরিদের কথার ওপর ভক্তি রয়েছে।

তারা আরও বলেন, ভুল ক্ষমাযোগ্য। আর হাম্বলি মাযহাবের ফকিহদের মতে ভুলে যাওয়া যদি অজ্ঞতার কারণে হয়, অর্থাৎ যদি সে না জানে যে, তার অমুক স্থানে নাপাকি রয়েছে এবং পরবর্তীতে গিয়ে যদি তা প্রকাশ পায়, তবে এতে সে নামাজ আর পুনরায় আদায় করতে হয় না।

আর শাফেয়িগণের নিকট, আপনি যখন কাপড়ে কোনো নাপাকি দেখতে পাবেন, তবে সে ব্যাপারে তাদের মতামত হলো, মূলনীতি অনুসারে নাপাকির বিষয়টিকে তার নিকটতম সময়ের দিকে সম্বন্ধ করা হবে। সুতরাং এ নীতি অনুসারে আপনাকে সর্বশেষ শৌচাগারে বা নাপাক কোনো স্থানে প্রবেশের ওপর নির্ভর করে তারপরের নামাজ আদায় করতে হবে। বোঝা গেল, এখানে নাপাকিকে তার নিকটতম সময়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে আপনার সর্বশেষ শৌচাগারে বা কোনো নাপাক স্থানে প্রবেশের সময়।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

‘যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির ওপর স্থাপন করে, সে উত্তম, নাকি ওই ব্যক্তি উত্তম, যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, যার কারণে সে ঘরসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়?’ [সুরা তাওবা- ১০৯]

‘যার কারণে সে ঘরসহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়?’ প্রকৃত অর্থেই কি একটি মসজিদ জাহান্নামের মধ্যে পতিত হবে, নাকি তাকে রূপক অর্থে

ব্যবহার করা হয়েছে? যেমন আমরা বলে থাকি : 'তার মা হচ্ছে হাবিয়া।' [কুরআনের ব্যবহারে এর অর্থ হচ্ছে, 'তার স্থান হবে হাবিয়া দোজখে।'] সুতরাং কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, এখানে তার বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হবে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি এমন ধোঁয়া দেখেছি, যা মসজিদ থেকে বের হচ্ছে। আর আর একদল মুফাসসিরের অভিমত হলো, এর দ্বারা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ এ আয়াতের ওপর নির্ভর করে বলেন, সে মসজিদটি পৃথিবীতেই একটি জাহান্নাম।

সপ্তত্রিংশ মজলিস

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۞ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۞

'বস্তুত আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে থেকেছিল, যখন তাদের এন্টি দলের অন্তর টলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি অতি সদয়, পরম দয়ালু।

এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখা হয়েছিল। অবশেষে যখন এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল, আল্লাহর (ধরা) থেকে খোদ তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে রুজু করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।' [সুরা তাওবা : ১১৭-১১৯]

আল্লাহ তাআলা নবির ওপর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন কেন? কী কারণে? ক্ষমা তো হয়ে থাকে গুনাহ, ভুল, অপরাধ ও স্খলনের পর! তার কারণ হয়তো (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন) আল্লাহ তাআলার সেই বাণীকে সুদৃঢ়করণ: 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, আপনি তাদের [পশ্চাদপদের] অনুমতি দিয়েছিলেন।' নবিজির কাছে যারা যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অপারগতা প্রদর্শন করেছিল, তিনি তাদের যুদ্ধে বের না হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াতেও হয়তো তা-ই বলা হচ্ছে।

আপনি কেন তাদের অনুমতি দিলেন—পশ্চাদে বসে থাকার জন্য অথবা যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য? দুটো বিষয়ের প্রতিই আল্লাহ তাআলা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছু মুনাফিককে যুদ্ধে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.

'তারা যদি তোমাদের সঙ্গে [যুদ্ধে] বের হতো, তবে তারা বিভ্রান্তি আর বিপর্যয়ই সৃষ্টি করত।' 'তারা তোমাদের মাঝে চোখলখুরি এবং ফাসাদ সৃষ্টির মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি করত। তোমাদের মাঝে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য লোক নিয়োগ করা আছে। আল্লাহ জালিম অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' [সুরা তাওবা- ৪৭]

তাই ইমাম বা দলপ্রধানের জন্য কোনো গুজব রটনাকারী, হতাশা উদ্রেককারী এবং ফিতনা ও বিবাদ সৃষ্টিকারীকে সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া ঠিক নয়। তার জন্য উচিত হলো, এ ধরনের লোকদের ফিরিয়ে দেওয়া। এ কারণে যারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আগমন করছে, মুজাহিদগণের সঙ্গে চলাফেরা করছে, তাদের মধ্যে যারা আফগান মুজাহিদ সম্পর্কে বলে বেড়ায়, 'এদের মধ্যে দেখি বিদআত রয়েছে; এসব লোক তো শিরকের মধ্যে লিপ্ত; আবার এরা দেখি গলায় তাবিজ-কবজও ঝুলায়;' এসব লোককে সৈন্যদলের মধ্যে শামিল হওয়ার অনুমতি দেওয়া কোনোভাবে বৈধ নয়। কারণ, তাদের একজন দশজনকে নিরাশ করে ফেরাবে। তাই এমন কাজ কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

যখন আপনি প্রশান্তচিত্তে এ কথা বুঝতে পারলেন এবং বিষয়টি আপনার অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল যে, এটা কোনো সাধারণ যুদ্ধ নয়, বরং এটা হলো ইসলামি জিহাদ তখন আপনি আর পিছিয়ে থাকবেন কেন? আসুন, সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি যখন মনে করছেন, এ জিহাদের সৈন্যদল তাবিজ-কবজ ইত্যাদি ব্যবহার করার কারণে বা কবরকে

ছুঁয়ে দুয়া করার কারণে তাদের সকলে মুশরিক বা তাদের অধিকাংশ মুশরিক এবং এ বিধান সীমিত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তখন আপনার মতো এ ধরনের মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া বৈধ নয়। এ ধরনের মানসিকতা লালনকারীদের জন্য মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে বের হওয়া বৈধ নয়, তাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়া বৈধ নয়, তাদের জন্য কোনো সৈন্যঘাঁটিতে প্রবেশ করা বৈধ নয়। এসব কিছুই তাদের জন্য বৈধ নয়। মুজাহিদ বাহিনীর আমিরের জন্য এবং যেকোনো ইসলামি দলের প্রধানের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, এ ধরনের লোকদের তাড়িয়ে দেওয়া।

ফকিহগণ স্পষ্ট করে এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তা হারাম। কেউ বলেছেন, মাকরূহ। কেউ বলেছেন, ইমামের জন্য বৈধ নয় যে, তিনি কোনো হতাশা সৃষ্টিকারী এবং বিবাদকারীকে সৈন্যদের সঙ্গে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন, তবে যদি এখানে তিনি কোনোরকমের ফিৎনার আশঙ্কা করেন, তবে ভিন্ন কথা। এখানে শরিয়তের একটি মূলনীতি কাজ করছে, তা হচ্ছে, ক্ষতি এবং ফাসাদের জিনিসকে দূর করা, দুটি ক্ষতির বড়টির প্রতি মনোনিবেশ করা। ছোট ক্ষতিটিকে রেখে বড়টি ছেড়ে দেওয়া ভালো। সেটিকে দূর করার দ্বারা যদি কোনো ফিৎনার সৃষ্টি হয়, যেমন সে কোনো সম্প্রদায় বা গোত্রপতি, তবে তাকে হয়ত বিতাড়িত করা যাবে না। যদি তাকে বিতাড়িত করা হয়, তাহলে এখানে ফিৎনা সৃষ্টি হবে, তবে এক্ষেত্রে তা নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই ভাল; কিন্তু তার ডানা কেটে রাখবে, তাকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করবে না। যেন কর্তৃত্ববলে কিছু করতে না পারে। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। এই দুটি সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার পরও আপনি কীভাবে তাদেরকে সৈন্যবাহিনী মুজাহিদদের সঙ্গে বের হওয়া অনুমতি প্রদান করলেন!

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ.

'আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নবির অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নবির অনুগামী হয়েছিল এমন সঙ্কটমুহূর্তে যে, তাদের একদলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।' [সুরা তাওবা- ১১৭]

এ সঙ্কট ছিল আত্মিক সঙ্কট এবং জাগতিক সঙ্কট। লোকেরা নানা বিপদাপদ এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। তারা তীব্র দাবদাহ এবং গরম সহ্য করছিল।

একটু ভাবুন, সাহাবাদের কারও কাছে হয়ত দুই সা' [সোয়া দুই কেজি বা সর্বোচ্চ আড়াই কেজি] খেজুর আছে। দেখুন, তার মাত্র দুই সা' খেজুর! তিনি সেখান থেকে এক সা' নিয়ে এসেছেন সদকার জন্য আর আরেক সা' বাড়িতে রেখে এসেছেন এবং বলছেন, আমি এক সা' সদকার জন্য নিয়ে এসেছি এবং আরেক সা' বাড়িতে রেখে এসেছি!

মুনাফিকরা এ নিয়ে টিপ্পনি কাটতে লাগল, 'এমন খেজুর থেকে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।' তাদের এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যাদের নিজের শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করবেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' [সুরা তাওবা: ৭৯]

একটু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ এই এই এক সা' খেজুর সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন, যা তেলাওয়াত করা হচ্ছে। দুই কেজি খেজুরের কারণে একটি আয়াত নাযিল করা হল, যা তেলাওয়াত করা হচ্ছে। তার কারণে বিজয় এসেছে। বিজয় এসেছে, এই নিষ্ঠাবান গরিব বান্দাটির জন্য। আল্লাহ

বলেছেন, '[মুমিনদের সঙ্গে যারা টিপ্পনি কেটেছে] আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করবেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' 'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যাদের নিজের শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং বিদ্রূপ করে।' আবু আকিল যিনি কিনা এক সা' খেজুর দান করেছেন, যার কাছে নিজের শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই দান করার। এর কোনো পরিমাপ নেই। কারণ, এটি তো মাপে হয়ত এক সা' খেজুর; তবে এই এক সা' খেজুর আল্লাহর নিকট হয়ত শত শত সা' থেকেও উত্তম।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, একটি দিরহামও হাজার দিরহামকে ছাড়িয়ে যাবে। সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা কীভাবে হবে? নবিজি বললেন, কোনো এক ব্যক্তির কাছে হয়ত দুটি দিরহাম বা টাকা আছে। আর সে সেখান থেকে একটি দিরহাম দান করে দিল, তবে তার এই দিরহামের দান ঐ ব্যক্তির শত হাজার দিরহাম দান করার চেয়েও উত্তম, যার কাছে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। আপনি হয়ত দশটি টাকা দান করলেন, যা ব্যতীত আপনার আর কোনো টাকাই নেই, তবে আপনি মিযানের পাল্লায় মিলিয়ন রিয়াল দান করার চেয়েও অধিক সাওয়াব পাবেন। হ্যাঁ, একটি দিরহামও হাজার দিরহামকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা দান কবুল করবেন এবং তার মহান প্রতিদান দান করবেন, দানকারীর সক্ষমতার ওপর। তার শ্রম ও কষ্টের ওপর, যারা কিনা তাদের শ্রম ব্যতীত কিছুরই মালিক নয়, কিছুই তাদের হাতে নেই দেওয়ার মত।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ চার হাজার দিরহাম নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমার কাছে আট হাজার দিরহাম ছিল, এখানে চার হাজার দিরহাম, বাকি চার হাজার দিরহাম আমার পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। নবিজি বললেন, আল্লাহ তোমার মাল এবং পরিবারের মধ্যে বরকত দান করুন। মুনাফিকরা বলতে শুরু করল, সে এগুলো লোক দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছে। এসব মুনাফিকেরা গল্পের আসরের মধ্যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে, তাদের প্রত্যেকেই পাথরে টেক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আর নবিজি চাদর ছড়িয়ে বসেছে, কেউ আসছে গম নিয়ে, কেউ আসছে খেজুর নিয়ে, একজন আসছে মুদ্রা নিয়ে, আর তারা যেই আসছে,

তাকে নিয়েই টিপ্পনি কাটছে, বিদ্রূপ করছে। তাদের অসদাচরণ থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। তাদের একেকজন নিজের গোঁফে তা দিচ্ছে। তারা শুধুমাত্র আগন্তুকদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উপহাস করছে, সাহাবিগণের নিয়ত নিয়ে অপবাদ দিচ্ছে, 'এসব লোক দেখানো, এসব কিছুতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না' ইত্যাদি।

এই যে সাহাবি, যিনি চার হাজার দিরহাম নিয়ে এসেছেন, তাকে বলছে, এটি রিয়া বা লোক দেখানো সদকা! ঐ সাহাবি এলেন এক সা' নিয়ে। তার ব্যাপারে বলছে, আল্লাহ তোমার এই এক সায়ের ঠুনকো দান থেকে অমুখাপেক্ষী। বাস্তবেই মানুষের প্রকৃতি এমন, যা অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই, আপনি মুনাফিক এবং হিংসুকদেরকে কীভাবে সন্তুষ্ট করবেন? তাদেরকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। এখানে বিষয়টি কোনো দলিল-প্রমাণের বিষয় নয়। কুরআনে বলা হয়েছে, (তারা যদি প্রতিটি নিদর্শনও দেখে নেয়, তবুও তারা ঈমান আনবে না।) অসুস্থ হৃদয়-মন, রোগাক্রান্ত সত্তা, তাকে কিসে পরিতৃপ্ত করবে? তাকে কে সন্তুষ্ট করবে? তাকে কিছুই সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত করতে পারবে না!

নবিজি মিম্বারের ওপর বসলেন এবং মানুষকে সদকার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগলেন। উসমান ﵁ দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি একশত উট তার জিনপোশ ও গদিসহ দান করব। নবিজি তার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। এরপর আবার সদকার জন্য উৎসাহিত করতে শুরু করলেন। আবার উসমান ﵁ দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি একশত উট তার জিনপোশ ও গদিসহ দান করব। আবারও নবিজি সদকার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। এবারও উসমান ﵁ দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি একশত উট তার জিনপোশ ও গদিসহ দান করব। নবিজি বললেন, উসমানের আর কোনো সমস্যা নেই আজকের পর সে যেই আমলই করুক না কেন।

ব্যস, হে আল্লাহ, আপনি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ, আপনি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান- শিয়ারা লাঞ্ছিত হোক- আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি।'

নবিজি বললেন, যে ব্যক্তি কঠিন মুহূর্তে কোনো সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে দেবে, তার জন্য জান্নাত! উসমান ﷺ সে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি কোনো কূপ খনন করবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে! উসমান ﷺ তাও খনন করে দিলেন। এরপর সে আপনাকে বলল, এ তো যিন্দিক, যিন নুরাইন, রাসুলদের দুই কন্যার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি তার পর্দা এবং আবরণকে শিথিল করেনি অথবা দরজা বন্ধ করেনি, উসমান ﷺ ব্যতীত। আমাদের উসমান ﷺ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি রাসুলদের দুজন মেয়েকে বিবাহ করে নি, তাকে যুন নুরাইন বলা হয়। একটি নয়, দুটি নুরের অধিকারী! এরপরও এসব লোকেরা বলছে, তারা মুনাফিক, তারা যিন্দিক, রাসুলের ইন্তেকালের পর তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, এমনই আরও কত কথা!

তাবুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের খাবার ছিল শুকনো খেজুর, বিকৃত গম, পূতিগন্ধময় চর্বি। সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় প্রয়োজনের জন্য চর্বি জমিয়ে রাখতেন, যা দীর্ঘ দিন অতিক্রম হওয়ার কারণে তার গন্ধ পূতিময় হয়ে যেত। গম ও জবকে টুকরো টুকরো করতেন এরপর তা সেই চর্বি দিয়ে মাখতেন, সামান্য পানি দিয়ে কিছুক্ষণ আগুনে রাখতেন এরপর তা খেয়ে নিতেন। আর খেজুরের অবস্থা তো এই ছিল যে, একটি খেজুর সাহাবাদের একটি দল খেতেন। একজন একটু চুষে নিয়ে অপরকে দিতেন, তিনি পানি দিয়ে ধুয়ে হয়ত তা পান করতেন এরপর অপরজন। এভাবে খেজুরটি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চক্কর দিয়ে ফিরত। শেষপর্যন্ত দেখা যেত তার আটিই শুধুমাত্র অবশিষ্ট আছে! এই সঙ্কটের কালে একবার চুষে নেওয়াই ছিল সুযোগ।

ইমাম মুসলিমসহ আরও অনেকেই হাসান ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানরা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। একটি উটের বাহন নিয়ে হয়ত বের হতেন এরপর বাহনের পরিমাণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। একেকটি উটের ওপর দুইজন তিনজন করে পর্যায়ক্রমে আরোহন করতেন। তাদের সফরের পাথেয় ছিল শুকনো খেজুর, বিকৃত জব, গম, পূতিগন্ধময় চর্বি। একটি দল বের হতেন, দেখা যেত তাদের সঙ্গে সামান্য কিছু খেজুর ছাড়া কিছুই নেই! এরপর খিদে যখন চরমে পৌছুত, তখন

একটি খেজুর নিয়ে এমনভাবে চুষে নিতেন যে, তিনি তার স্বাদ অনুভব করতে পারতেন, এরপর তা অপর সঙ্গীকে দিয়ে দিতেন, এরপর এক ঢোক পানি পান করতেন। এভাবে তাদের সর্বশেষ সঙ্গীটি পর্যন্ত সে খেজুর চলত, অবশেষে দেখা যেত, তার আটি ব্যতীত কিছুই নেই। এভাবে তারা নবিজির সঙ্গে চলতেন, তাদের অঙ্গীকারের সত্যতা ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

সঙ্কটময় কাল সম্পর্কে যখন উমর ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে বের হলাম, যখন প্রচণ্ড পিপাসা পেত আমরা কোনো জায়গায় অবতরণ করতাম, আমরা এমন প্রচণ্ড পিপাসিত যে, ভাবতাম, আমাদের গর্দান বুঝি পিপাসার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে! এমনকি সঙ্গীরা তাদের উটগুলিকে জবেহ করছিল এবং তার গোবর বা পাকস্থলির খাবার নিংড়ে পানি বের করে পান করত, আর অবশিষ্টটুকু তার যকৃতের ওপর রেখে দিত, তার বুকের ওপর পশুর পাকস্থলির অবশিষ্ট রেখে দিত যেন তার কারণে গরম একটু কম অনুভূত হয়!

আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তো আপনার কল্যাণের দুআ কবুলের অঙ্গীকার করেছেন, আপনি আমাদের জন্য একটু দুআ করুন। নবিজি বললেন, আমি দুআ করি, এটি কি তুমি চাও? অর্থাৎ, তুমি কি আমার দুআ করাকে পছন্দ কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর নবিজি তাঁর হাত উত্তোলন করলেন, দুআ করছেন, তখনো তিনি তাঁর হাত নামিয়ে আনেন নি, আসমান মেঘে ছেয়ে গেল, পানি বর্ষণ হল। সবাই তাদের পাত্রগুলো ভরে নিল। এরপর আমরা অগ্রসর হলাম তা দেখার জন্য, কিন্তু সে মেঘমালার কিছুই দেখতে পেলাম না, সেটি আমাদের সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্পকে ছাড়িয়ে গেছে।

আবু হুরায়রা এবং আবু সাঈদ বলেন, তাবুকের যুদ্ধে আমরা নবিজির সঙ্গে ছিলাম। সবাই প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসায় ভুগতে লাগল। সবাই নবিজির কাছে এসে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদেরকে যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমরা আমাদের জন্তু ও পশুগুলোকে জবাই করব। যেমন উট আছে, যার ওপর পানি বহন করা হয়। আমরা আমাদের কিছু পশু জবাই

করব খাব ও তার চর্বিগুলো তেল হিসেবে ব্যবহার করব। যেন আমাদের হাত-পা ফেটে না যায়।

নবিজি বললেন, তোমরা চাইলে করতে পার। এমন সময় উমর ﷺ আসলেন। তিনি এসে আপত্তি করে বললেন- হে আল্লাহর রাসুল, তারা যদি এমনটি করে; তবে বাহনের পশুর ঘাটতি দেখা দেবে। তারচে' বরং তাদের অতিরিক্ত বা এখনো থেকে যাওয়া খাবার-দাবার, পাথেয়ের মধ্যে বরকতের দুআ করে দিন; হতে পারে আল্লাহ তাতে বরকত দান করবেন। নবিজি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর নবিজি একটি চওড়া চামড়া আনার জন্য বললেন। সে চওড়া চামড়াটি বিছালেন এরপর সবার কাছে থাকা খাবারগুলো আনতে বললেন। দেখা গেল কেউ এক মুষ্ঠি শস্য নিয়ে এলেন, অপরজন এক মুঠ খেজুর নিয়ে এলেন অন্যজন নিয়ে এলেন রুটির কিছু টুকরো, এভাবে এই কয়েক মুঠ খাবার-দাবার চামড়ার ওপর একত্রিত হল।

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আমি খাবারগুলো পরিমাপ করে দেখলাম। তাতে দেখলাম, একত্রিত খাবারের পাত্রটি হাটু গেড়ে বসার পরিমাণ হবে বা বর্শার পরিমাণ আর একটি বড় বর্শা তিন ফুটের মত হয়ে থাকে। নবিজি এ খাবারের মধ্যে বরকতের দুআ করলেন এবং বললেন, তোমরা তোমাদের পাত্রগুলোতে এসব খাবার ভরে নাও। আবু হুরায়রা বলেন, সবাই তাদের পাত্রগুলো ভরে নিলেন। এমনকি ঐ সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ক্যাম্পে এমন কোনো পাত্র ব্যাগ ছিল না, যা তারা ভরেন নি। সবাই পেট পুরে খেয়ে নিলেন এবং আরও অনেকটাই থেকে গেল। নবিজি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আমি তাঁর প্রেরিত রাসুল। যে ব্যক্তি এই দুটি কালিমা নিয়ে কোনো সন্দেহ ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে, তাকে কোনো জিনিস জান্নাত থেকে দূরে রাখতে পারবে না। ইমাম মুসলিম হাদিসটি তাঁর সহিহ গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন।

আপনি কি জানেন, তারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিন হাজার! তাদের সবাইকে যদি গমের একটি করে দানাও দেওয়া হয়, তবেও কি একত্রিত করা খাবার তাদের জন্য যথেষ্ট হত? তিন হাজার গমের দানা! নিয়ে এলেন হাটু গেড়ে বসার পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য অথচ তিনি বলছেন, 'এমনকি ঐ সত্তার

কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ক্যাম্পে এমন কোনো পাত্র ব্যাগ ছিল না, যা তারা ভরেন নি। সবাই পেট পুরে খেয়ে নিলেন এবং আরও অনেকটাই থেকে গেল।' তারা কতজন ছিলেন? তিন হাজার। তারা যদি প্রত্যেকেই একটি করে রুটির টুকরো খেতেন; তবে তিন হাজার টুকরো লাগত। প্রতি দশজনে এক কিলো রুটি। অর্থাৎ, তারা প্রতি দশজনে এক কিলো করে খেয়েছেন। তিন হাজার জনে খেয়েছেন। সবমিলে প্রায় তিন টন। যা কিনা একটি গাড়ির ওজনের চেয়ে বেশি!

এ তো শুধু তাঁরা খেয়েছেন। ধরুন, দশজনে এক কিলো খেয়েছেন। প্রতিজনে তাদের পাত্রে যদি এক কিলো করে সঞ্চয় করে থাকেন, তবে এখানে তিন হাজার কিলো। তাহলে কত হল? তিন টন। আর এই তিন টনের মূল হচ্ছে, তিন কিলো। যাদের কেউ নিয়ে এসেছিল রুটির টুকরো, কেউ এক মুষ্ঠি শস্যদানা আর কেউ এক মুঠ খেজুর।

আর তাই বলব, নিশ্চিত থাকুন, আল্লাহ তায়ালাই মুজাহিদগণের অভিভাবক হবেন, হবেন কর্মবিধায়ক। হালাল রিযিকের দায়িত্বশীল। আল্লাহ তাদের দায়িত্বভার নিয়েছেন, যারা মুজাহিদ হিসেবে ঘর ছেড়েছে এজন্য যে, তারা শহিদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা যে প্রতিদান ও গণিমত সে অর্জন করেছে, তা নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে, আর আল্লাহই তাঁর কর্মবিধায়ক। হয়ত সে শহিদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, নতুবা মর্যাদাবান ও সম্মানিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন। তবে প্রতিদান ও গণিমতসহ ফিরে আসা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার, আর আত্মিক কষ্ট সে আরও কষ্টের।

একজন ইহুদি ছিল, যার নাম সুয়াইলিম। সুয়াইলিম সে তার বাড়িতে বন্ধুদেরকে জমা করত। মুনাফিকরা প্রতিরাতে তার বাড়িতে একত্রিত হত এবং বলত, এ কি বনি আসফারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে, লড়াই করবে? রোমের সঙ্গে লড়াই করবে? আল্লাহর কসম, আগামীকাল আমি তাদের রশিতে পিঠমোড়া বাঁধা দেখব, যারা হবে রোমের বন্দী! বনি আসফারের যোদ্ধারা কি আরবদের মত লড়াই করতে পারবে?

জাদ ইবনে কায়েস যে কিনা মুনাফিকদের একজন সঙ্গী। সে একদিন এমন ওজর আপত্তি নিয়ে এল, যা কিনা গুনাহের চেয়ে বিশ্রী! যাকে অশ্লীল কাজ বলে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি মহিলাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারছি না, আমার ভয় হচ্ছে, আমি যখন বনি আসফারের মেয়েদেরকে দেখব, রোমের মেয়েদেরকে দেখব, আমি তাদের থেকে ধৈর্য রাখতে পারব না। আমাকে আপনি অনুমতি প্রদান করুন! কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.

'আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেৎনায় ফেলবেন না। সাবধান, তারা তো ফেৎনাতেই পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফেরদেরকে বেষ্টন করে আছে।' [সুরা তাওবা- ৪৯]

মদিনার মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। নবিজি সেদিকে দেখছেন না। মোটেও ভ্রুক্ষেপ করছেন না। তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। মানুষকে আদেশ করছেন। উৎসাহ দিচ্ছেন। আল্লাহর রাস্তায় বের হও। জিহাদের জন্য বের হও! আমরা রুমের সঙ্গে লড়াই করব। সবার মধ্যেই একই অবস্থা। আবু উকাইল- সে রাতে এক ইহুদির বাড়িতে গেলেন। রাতভর পানি সেচের কাজ করলেন। এ করে তিনি দুই সা খেজুর পেলেন। তা থেকে তিনি এক সা' জিহাদের জন্য দান করলেন, এক সা' পরিবারের লোকের জন্য রেখে দিলেন।

আর ঐ তো যায়দ ইবনে আলবা- রাতভর কান্নাকাটি করলেন, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, ইয়া রব! তুমি জিহাদের আদেশ করেছ, আর আমি কোনো টাকা-পয়সারই মালিক নই! আমি তোমার রাসুলের কাছে গিয়েছিলাম, তিনিও আমাকে বাহন হিসেবে কিছু দিতে পারেন নি!' এভাবে তিনি কেঁদেই চলছেন আর বলছেন, 'ইয়া রব! আমি মুসলমানদের জন্য আমার ইজ্জত, সম্মান, সহায়-সম্পত্তি যা কিছু আছে, সব সদকা করে দিলাম!

নবিজি পরের দিন বললেন, আজকের রাতে কে সদকা করবে? তার কাছে যা ছিল, সে তার সবকিছুই সদকা করে দিয়েছে। এখন আর তার দান করার মত কিছু নেই। তিনি বললেন, আমি আমার সম্পত্তি মুসলমানের জন্য সদকা করেছি! যারা আমাকে নিন্দা করেছে, তার কাছে আমার যে খেজুর রয়েছে সে কারণে, আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছি! নবিজি বললেন, আজ রাতে কে সদকা করবে? কেউ দাঁড়ালেন না। নবিজি আবার বললেন, আজ রাতে কে সদকা করবে? এবার যায়েদ দাঁড়ালেন এবং বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আগামী বছরের জন্য সদকা কবুল করলাম। তার কাছে দান করার মত কিছুই ছিল না, তাই তিনি মানুষের কাছে প্রাপ্য জিনিসগুলোই ক্ষমা করতে শুরু করলেন। বললেন, আমি আগামী বছরের জন্য সদকা দেব!

নবিজি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সময় পার করছেন। ওদিকে কেউ বসে কুৎসা করছে, ওখানে কেউ জমা হচ্ছে, ওদিক থেকে কেউ নানা কথা বলছে।

আর এ কারণে আমরা ইনশাআল্লাহ জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকব, আফগানে যাব, অন্যদেরকে আফগানে পাঠাব। আর এসব লোকেরা বসে নানা কথা বলুক, অপবাদ দিক.... এতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা আমাদের পরিকল্পনায় অটল থাকব, নিজেদের কাজ চালিয়ে যাব। আল্লাহ বলেন-

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.

'অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায়, এবং যা মানুষের জন্য উপকারী, তা জমিনে স্থির হয়ে থাকে।' [সুরা রাদ: ১৭]

আর সে নিজের দেশে পরম আরামে পায়ের ওপর পা রেখে নিজের ছেলেকে উপদেশ দিয়ে চলছে, বাবা শোন, আমি তোকে মন থেকে বলছি, এসব জায়গায় যেও না! এখানে কেন যাবে? তোমাকে আমি সত্যিই মন থেকে বলছি, যাস নে কিন্তু! আরে বাবা এ তো আমেরিকা এবং রাশিয়ার যুদ্ধ! এসব নিয়ে কথা বলার শক্তি আমাদের নেই। আমরা শুধু কিছু মানুষের সঙ্গে

কথা বলব। ভাই, আমার বোঝার কেন চেষ্টা করছ না? আফগানে তো একজন অপরজনের সঙ্গে লড়াই করছে, হানাহানি করছে শুধু এই কথাটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যাব, যারা বোঝার বুঝবে, যারা তা মূল্যায়ন করার করবে। তবে সর্বসাধারণের সামনে বলব না, কাজেই বসে যাও, বসে যাও, কেন ওখানে যেতে চাচ্ছো? তুমি তো এখানে সুরক্ষিত বেষ্টনির মধ্যে আছো, কতকিছু করতে পারছো। আর এখানে ইনশাআল্লাহ অচিরেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই সকাল অচিরেই আসবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর কসম তারা তো স্বপ্নই দেখছে! স্বপ্ন। বুঝতে পারলেন, স্বপ্ন। কীভাবে বলুন তো দেখি? আল্লাহর কসম, তাদের ইচ্ছা যে, তারা একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে কোনো প্রকার জিহাদ ছাড়াই, কোনো রক্তপাত এবং গর্দান দেওয়া ছাড়াই। আল্লাহর কসম, তারা তো এক দিবাস্বপ্নে বিভোর। স্বপ্নের মাঝে অনেকসময় স্বপ্নদ্রষ্টা বুঝতে পারে যে, সে স্বপ্ন দেখছে। তবে তাদের কথা ভিন্ন, তাদের এ শক্তিও নেই যে, তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তারা স্বপ্ন দেখছে। কারণ, উদ্ভট ভাবনা থেকে স্বপ্ন এবং এমনি স্বপ্নের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ স্বপ্ন সত্যও হয়, আর কল্পিত এলোমেলো ভাবনা কখনো এক হয় না। এ তো আমার দুই বছরের দুধের শিশুর ন্যায়, যার বয়স মাত্র দুই বছর, যখন কোনো একদিন প্লেনে উঠল- বলে বসল, বাবা, আপনি কেন আমার জন্য একটি প্লেন ক্রয় করছেন না? হ্যাঁ, বলুন, কেন কিনছেন না? তার এই ভাবনা সেই ব্যক্তির মতই যে কিনা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে কোনোধরনের রক্তপাত, জিহাদ ও তার প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই!

অথবা ফিলিস্তিনি যারা ইচ্ছা করে যে, ফিলিস্তিন উদ্ধার হবে, তাদের কেউ পিস্তল, রাইফেল আর ক্লাসিনকোভের প্রশিক্ষণ ব্যতীতই! যেসব ফিলিস্তিনিরা সৌদি, কুয়েত, কাতার, দুবাইতে বসবাস করছে, যখন কোনো ফিলিস্তিনি এখানে আসতে চায়, তাকে তারা বলে, আরে তুমি তো ফিলিস্তিনি! তুমি কি ফিলিস্তিনকে ভুলে গেছ? তুমি আফগানে ব্যবসা করছ আর ফিলিস্তিনকে ভুলে গেছ? তুমি ফিলিস্তিনের জন্য কী করেছ? তোমার বিশটি বছর কেটে গেছে উপসাগরেই, তুমি কী করেছ? ফিলিস্তিনের ভূমি আল্লাহর কাছে তোমার

ব্যাপারে অভিযোগ করবে! ফিলিস্তিনি সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে, অস্ত্র চালনা শিখবে, মুসলমানের ইজ্জত সম্মান কি তা জেনে যাবে, স্বশস্ত্র যুদ্ধ শিখবে, হয়ত এর দ্বারা তার দেশ এবং উম্মতের উপকার করতে চেষ্টা করবে, হয়ত সে ভাববে, মসজিদে আকসায়ও যুদ্ধ শুরু হোক.....! সর্বনাশ, তুমি ফিলিস্তিনি হিসেবেই বেঁচে থাক, তুমি ফিলিস্তিন ভুলে গেছ! রাখো দেখি, বল ফিলিস্তিন!

ফিলিস্তিনের জন্য আহাজারি করতে আরবি দেশগুলোর চেয়ে কি কাউকে বেশি অভিজ্ঞ পাওয়া যাবে? ফিলিস্তিনের জন্য আহাজারি আর মাতম করার জন্য আরবি দেশগুলো কর্তাব্যক্তিদের চেয়ে উত্তম কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা তাদের থেকে কাজ নয়, শুধু কথা শিখেছি। লম্বা বুলি, সঙ্কীর্ণ বাহু। কাজ কর, এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকো না। (মানুষকে তার সাধ্যের বাহিরে কোনোকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না।) আল্লাহ কম হলেও তার মধ্যে বরকত দান করেন, তার কাছে অল্পস্বল্পও নেই। অনেকও কম যদি তা তার সঠিকভাবে ব্যবহার না হয়, কমও বেশি, যদি তা সঠিকভাবে মাপা যায়। আল্লাহ বলেন-

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ.

'আপনি বলুন, ভাল আর মন্দ কি এক হতে পারে? যদিও তোমাকে মন্দের আধিক্য আশ্চর্যন্বিত করে।' [সুরা মায়েদা: ১০০]

সাহাবাগণ সবাই তাবুকের যুদ্ধের ময়দানের দিকে চলে গেলেন, তাদের কিছু থেকে গেলেন পেছনে। আবু খায়সামা পেছনে থেকে গেলেন, আর পেছনে থাকলেন আবু যার। আবু খায়সামা তার বাড়িতে ফিরে এলেন। তিনি দুটি বিবাহ করেছেন। আর তার স্ত্রীরা গরমকাল বাগানে কাটাতেন। বাগানের মধ্যে তাবু গাড়তেন। আবু খায়সামা ফিরে এলেন, এসে দেখলেন তার দু' স্ত্রীই তাবুর ভেতর। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে, সুন্দর ফলফলাদি। তিনি দুই তাবুর দরজায় দাঁড়ালেন এবং বললেন, আবু খায়সামা ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে আছে আর রাসুল যুদ্ধের পথে, যুদ্ধের ময়দানে গরম, উত্তপ্ত রোদ্র, লু-হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন! আল্লাহর কসম, আমি এদের দু-জনের কারো কাছেই

প্রবেশ করব না। তোমরা আমার সাওয়ারি প্রস্তুত কর! তাঁর দু-স্ত্রীই তাকে বোঝানোর এবং সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল।

সাহাবাগণ বলেন, দূরে এক আগন্তুককে দেখা গেল। নবিজি বললেন, সে যেন আবু খায়সামা হয়। দেখা গেল তিনি আবু খায়সামাই।

আর সুপরিচিত আবু যার, দুনিয়াতে যে একজন ফকির, মিসকিন, তবে আল্লাহ যদি চান, তবে আখিরাতের জীবনে তিনি অবশ্যই সফল এবং ধনী। আবু যারের চেয়ে কোনো সত্যকণ্ঠের ব্যক্তিকে বৃক্ষাদি ছায়া দেয় নি, ধরার ধূলি উত্তোলন করে নি। তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, তিনি এমন একটি উটে আরোহন করেছেন, যেটি এতই দুর্বল যে, এক পা এগোয় তো এক পা পিছনে যায়। তিনি উটটি নিয়ে অনেক চেষ্টা করলেন, তবে কোনো লাভ হল না। তিনি উট ত্যাগ করলেন এবং হেঁটে গিয়ে মিলিত হলেন। তবে হ্যাঁ, সাহাবাগণ তাকে হারিয়ে ফেলেন, আবু যার কোথায় গেল? নবিজি তাঁর ব্যাপারে একটি কথা বললেন, আজ আমরা তাঁর ব্যাপারে বলব, তিনি বলেন, তার ব্যাপারটি রাখ, তার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, তবে আল্লাহ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন আর যদি কোনো অকল্যাণ থাকে; তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

আজ আমরা বর্তমান সময়ে অন্যান্য মুসলমানদের ব্যাপারে বলব, তাদের বিষয়টি ছেড়ে দাও, তাদের মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, তবে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের সঙ্গে আফগানিস্তানে মিলিত করবেন; আর যদি কোনো কল্যাণ না থাকে; আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাদের কথা বাদ দিন, তারা যেভাবে খুশি কথা বলতে থাকুক; তারকার লড়াই কেন চলছে? যুদ্ধ, তারা বলছে, তারকার যুদ্ধ! দুটি বড় দেশ, বড় দল ও গোত্রের মাঝে লড়াই! সত্যিই, এ যুদ্ধ তো তারকাদের লড়াই, দুটি বড় গোত্রের লড়াই, রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার লড়াই।

আর যেসব মানুষেরা কোনো রাজনীতি বোঝে না, তারা আপনাকে বলবে, তারা এখানে দ্বন্দ্ব করছে, তারা এখানে লড়াই করছে, তারা বলছে, তারা এমন, আমরা বলি কেমন? আমরা বলব, তাদের কথা বাদ দাও, যদি তাদের

মধ্যে কোনো কল্যাণ থেকে থাকে, তবে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন, আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তবে আমাদেরকে আল্লাহ তাদের থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

সত্যিই বিষয়টি কষ্টের ছিল। আর এ কারণেই তো (আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নবির অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নবির অনুগামী হয়েছিল এমন সঙ্কটমুহূর্তে যে, তাদের একদলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অত:পর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমার দৃষ্টি দিলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সবার ওপরই অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়। আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ করলেন,...)

হায় আফসোস! আহ কি কথা!! তাদের ঘটনাটি সুন্দর এবং শিক্ষণীয়। তাদের একজন কা'ব ইবনে মালেক, দ্বিতীয়জন হেলাল ইবনে উমাইয়া আর অপরজন মুরারা ইবনে রবি'।

নবিজি সেখানে অবশিষ্ট রজবসহ শাবান এবং রমজানের কিছু অংশ অবস্থান করলেন। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ﷺ-কে দাওমাতুল জানদালের দিকে প্রেরণ করলেন। দাওমাতুল জানদাল আযরাক জর্দানে অবস্থিত। সে দেশের নাম আযরাক। তেমনিভাবে আযরাহ, যা মায়ানের পাশে অবস্থিত, তেমনি তার পাশে রয়েছে, আইলাতুল উকবাহ। খালেদ ﷺ তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং তাদের থেকে জিযিয়া নিয়ে ফিরে আসেন। তার আনা জিযিয়ার মধ্যে কিছু খুবই পাতলা কাপড় ছিল। সাহাবায়ে কিরাম তা স্পর্শ করে দেখতে লাগলেন। তাদের মিসকিনি জীবন যা কোনোদিন দেখেনি। তাঁরা তা স্পর্শ করছিলেন এবং আশ্চর্যবোধ করছিলেন- আল্লাহু আকবার! কত মিহি কাপড় এগুলো! নবিজি বললেন, তোমরা এর কোমলতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছো? জান্নাতে সাআদ ইবনে মুআযের কাপড় এর থেকেও কোমল এবং মিহি হবে। আল্লাহু আকবার।

আর এ কারণে আমাদের কাছে যদি কেউ আঁতর-সুগন্ধী নিয়ে আসে, তবে আমরা বলব, ইয়াহইয়া ও খালেদের রক্ত এর চেয়ে সুগন্ধীযুক্ত। আমাদের

কাছে এরচে' উত্তম আঁতর রয়েছে। তাই যত সুন্দর সুগন্ধীই হোক না কেন, যেমন গোলাপই হোক না কেন, আবদুল মান্নান, খালেদ কুরদি ও হিশাম দাইলামির রক্তের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে এবং আমাদের কাছে এর চেয়েও উত্তম।

নবিজি তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। ওদিকে মুনাফিকরা নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে লাগল। এখানে এমনকিছু ফল ও পরিণতি পাওয়া যাবে, যা কিনা পাহাড়ের পার্শ্বদের ন্যায় কঠিন। এসব মুনাফিকেরা পরিকল্পনা করতে লাগল যে, আমরা নবিজির উটনির সামনে একটি উটকে উত্তেজিত করে দেব এতে করে নবিজির উটনি পড়ে যাবে, উটও আক্রান্ত হবে, উটনিও আক্রান্ত হবে!

জিবরাইল আসলেন এবং নবিজিকে এ খবর জানিয়ে দিলেন। নবিজি এতে খুবই রাগান্বিত হলেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির নবিজির উটনির রশি ধরেছিলেন আর তাকে পেছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান। সুতরাং হুজায়ফা গিয়ে উটগুলোর মুখে আঘাত করতে লাগলেন। মুনাফিকেরা বুঝে গেল, তাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছে, তারা মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ল এবং আত্মগোপন করল। কিন্তু নবিজি হুজায়ফা ﵁-এর কাছে তাদের সবার নাম বলে দিলেন, তারা কারা? কেউ বলেন, তাদের দু-জনের কাছেই বলেছেন। তারা ছিল তেরো জন। নবিজি বললেন, তারা নেফাকের ওপরই মৃত্যুবরণ করবে।

আর এ কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁-র সামনে যখন কোনো জানাযা হাজির করা হত, তিনি দেখতেন, অপেক্ষা করতেন। যখন হুজায়ফা অগ্রসর হতেন এবং মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতেন, তবে উমরও পড়তেন। যদি হুজায়ফা পেছনে থাকতেন, তবে উমরও তার জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকতেন।

একদিন উমর ﵁ হুজায়ফার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে হুজায়ফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমার নাম কি নবিজি

মুনাফিকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন? আল্লাহু আকবার, ভয়, কত কঠিন অনুভূতি!

আমাদের কেউ একজন দেখা যায়, একদিন যুদ্ধ করে নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ান ভাবতে শুরু করে। অথবা নেপোলিয়ানের মতই কেউ একজন। সে নিজেকে খালেদ বিন ওয়ালিদ ﵁-এর মত যোদ্ধা ভাবতে শুরু করে। এমনভাবে হাঁটে যে, কারো দিকে আর তাকায় না।

সাবধান, নিজেকে ধোকার মধ্যে ফেলবেন না। এখনো কিছুই করতে পারেননি। সাবধান থাকুন, নিজেদেরকে ধোকায় ফেলবেন না। আফগানিরা আপনাদেরকে যে সম্মান করে এ ব্যাপারে সাবধান। আপনারা যদি সাওয়ার হয়েও যান, তবুও তাদের পদব্রজদের স্তরে পৌছতে পারবেন না। আপনি যদি কোনো তেজি ঘোড়ায় সাওয়ার হোন, তবু তাদের আস্তে আস্তে হেঁটে চলা ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছতে পারবেন না। কারণ, এ ময়দানে তারা অনেক অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।

আবদুল্লাহ আনাস এখন কোথায়? প্রিয় বন্ধু আবদুল্লাহ আনাস বলতেন, আফগান জনগণের সম্মানদান সে এক আশ্চর্য বিষয়, যখন আমাদের কেউ ইশকেমাশ বাজারের পাশ দিয়ে অথবা অন্যকোনো জায়গা দিয়ে অতিক্রম করত, তাঁরা দাঁড়িয়ে যেত। তারা মিনতির সুরে বলতো- ভাই অনুগ্রহ করে আমার কাছে আসুন, বসুন। আমাদের কেউ যখন কোনো গ্রামে যেত এবং বলত, আমি আজ আপনাদের এখানে থাকতে চাই। সে আনন্দে দৌড় দিত এবং বলত, আজ আরবগণ আমার এখানে অবস্থান করবেন। দেখা যেত, সে তার কাছে যত উত্তম খাবার, বিছানা আছে, সবকিছু এনে উপস্থিত করত। আরবগণ আমার কাছে আসবে। অনেক কম বয়সী আরব, অভিজ্ঞতায় অপরিপক্ব, তাদের এমন সম্মান দেখে ভাবে, সে এক অসাধারণ কমাণ্ডার, অভিজ্ঞ উস্তাদ! সে জানে না, সে কোথায়। দেখা যায় সে গিয়ে কোনো কম্বল বা লেপ চাইল, সে ঐ কম্বলটি একটু শুকে নিয়ে আফগানির মুখের ওপর ছুড়ে মারল, আমি আরবি, আমি অমুক, চেন আমাকে?

হ্যাঁ, আপনি শুধু অমুক। ব্যস, এতটুকুই! আর সে কে? সে তো এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, যারা আট-দশ বছর জিহাদে কাটিয়েছে। তারা এমন নেতৃবৃন্দ- যারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, রুশ বাহিনীর পায়ের তলার মাটি এলোমেলো করে দিয়েছে। পায়ের তলায় যারা রুশকে পিষে ফেলেছে। যারা সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছে! আমি আরাবি, আমি অমুক, এই তো শুধু আমার পরিচয়, আমার বাহাদুরি!

প্রকৃতই, যদি তাদের এই সম্মানদান না হত, তবে কেউই সহ্য করতে পারত না! তাই, এখানে তাদের সম্মান প্রদান দেখে নিজেদেরকে অহংকারের ভেতর ডুবিয়ে রাখা মোটেই সমিচিন হবে না। কারণ, এসব তাদের ব্যক্তিত্বের, সত্যবাদিতা এবং উদারতার পরিচয়, এ আপনার সম্মান আর মর্যাদার বিষয় নয়।

কবি বলেন-

আরে তোমার কাছে তো এমন কোনো ঘোড়া নেই,
যা পথ দেখাবে, গন্তব্যে পৌছে দেবে,
না আছে কোনো ধনভাণ্ডার!
তাই, আমি বলি কি,
নিজের অবস্থা যখন এত শোচনীয়,
তখন সহানুভূতি পেতে নিজের মুখের ভাষাটিকে
কমপক্ষে একটু শুধরে নাও!

এই রুশ বাহিনীকে তুমি পরাজিত করোনি, লাঞ্ছিত করোনি, তুমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেছ?? যদি তুমি তাদেরকে প্রকৃত অর্থে সম্মান কর, তবে প্রকৃতই তাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখ। তারা তোমাকে আরবি হিসেবে দেখবে, যে কিনা তাদের হয়ে জিহাদ করছ! আর যদি তাদের ওপর অহংকার করতে চেষ্টা কর, তবে একটু দেখে নাও, তারা কারা? আমরা মুর্খতার ওপর মুর্খতায় লিপ্ত হচ্ছি?

সাবধান হয়ে যান, অহেতুক প্রতারিত হবেন না।

আল্লাহ তায়ালা যদি আপনার জন্য কল্যাণের কোনো পথকে সহজ করে দেন, তবে তার অর্থ তো এই নয় যে, আপনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। না, কখনোই নয়, এখানে এমন অনেক মানুষ আছেন, ব্যক্তি আছেন, যারা আপনার থেকে অনেক অগ্রগামী। তারা আপনার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন। তারা নিজেদের দামি এবং মূল্যবান অনেক কিছুই কুরবানি করেছেন, দামি বা সস্তা যাই বলুন, তারা তা খরচ করেছেন। নিজের সত্তা এবং আরাম-আয়েশকেও!

নবিজি যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে এলেন, মানুষেরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এল। নবিজির অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোনো সফর বা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

এখন আমরা পিছনে থেকে যাওয়া সেই তিন ব্যক্তির কথা শুনব। যে উত্তেজনাকর আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন কা'ব ইবনে মালেক ﷺ। কা'ব ইবনে মালেকের এ হাদিস ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুসলিম রহ. কা'ব ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমি নবিজির সঙ্গে কোনো যুদ্ধে পিছপা হই নি, প্রতিটি যুদ্ধেই নবিজির সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি, তবে তাবুক যুদ্ধ বতীত (কা'ব ইবনে মালেক কবি ছিলেন, ছিলেন প্রসিদ্ধ)। তবে আমি বদর যুদ্ধেও নবিজির সঙ্গে ছিলাম না, তখন এ কারণে কাউকে তিরস্কার করা হয় নি। সে যুদ্ধে নবিজি এবং কিছু মুসলমান বের হয়েছিলেন কুরাইশদের কিছু উটের উদ্দেশ্যে, তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা ধাওয়া করতে, তবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটিয়ে দেন অযাচিতভাবে। আমি নবিজির সঙ্গে লাইলাতুল আকাবায় উপস্থিত ছিলাম, সেখানে আমরা নবিজির হাতে বাইয়াত হয়েছিলাম ইসলামের ওপর। আমার খুবই প্রিয় বিষয় যে, আমি সেই বাইয়াতে আকাবায় উপস্থিত ছিলাম। অর্থাৎ আমি সে রাতে অনুপস্থিত থাকতাম আর তার পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম, তা আমার

কাছে প্রিয় নয়। যদিও বদরের ঘটনা মানুষের মাঝে অনেক বেশি আলোচিত ছিল, অনেক বেশি প্রসিদ্ধ ছিল।

তাবুকের যুদ্ধে আমার ঘটনা হল, যা থেকে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর কসম আমি ইতোপূর্বে কোনো যুদ্ধের জন্য দুটি বাহন সংগ্রহ করিনি, যা কিনা আমি তাবুক যুদ্ধের জন্য করেছিলাম। নবিজি তীব্র দাবদাহের মধ্যে যুদ্ধে করতে বের হলেন, সুদীর্ঘ পথের সে এক সফর ছিল। তাবুক যুদ্ধের শত্রু সংখ্যা ছিল অসংখ্য। মুসলমানদের জন্য তাদের বিষয়টি প্রকাশ করা হল, যেন তারা তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারেন। যুদ্ধের দিকও বলে দেওয়া হল, যেখানে নবিজির যাওয়ার ইচ্ছা।

নবিজি যখন কোনো যুদ্ধে বের হতেন, তখন তিনি যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার বিপরীতে যেতেন, তবে তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া। কারণ, এখানে পথের দূরত্ব ছিল বিস্তর। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে, তা-ও অনেক বড় দেশ। তাই, তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির দরকার আর তার জন্য বিষয়টি প্রকাশ করাও জরুরি। এ জন্য দীর্ঘ সময় উৎসাহিত করাও দরকার।

আর তাই, যারা রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তারাও তো আর ছোট বাহিনী নিয়ে মুকাবিলা করতে পারবে না। এ এমন এক বিষয় যেখানে ব্যক্তির প্রকাশ জরুরি, প্রয়োজন যুদ্ধাভিযান, তার জন্য উৎসাহিত করা, তার জন্য মানুষ বের হওয়া, এখানে এমন কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন, যারা প্রকাশ্যে জিহাদের দাওয়াত দিবে, জিহাদের কথা উচ্চারণ করে খুতবা-বক্তৃতা দেবে, হ্যাঁ!

আমি আফগানিস্তানে ছিলাম। তারই একটি কথা, এক মুজাহিদ তিনি আফগানি পোষাক এবং টুপি পরিধান করতেন। দোহার একটি বিমানবন্দর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেমন শায়খ তামিম। তাকে প্রশ্ন করা হত, আপনি তো জর্দানি, তবে কেন এ পাকিস্তানি পোষাক পরিধান করেন? তিনি বলতেন, আপনি আপনার জানার পরিধি আরো একটু বৃদ্ধি করুন, আরও একটু যাচাই করুন। এটি আফগানি পোষাক। আফগানি পোষাকের কী অর্থ? তিনি বলেন, এই পোষাকের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে ইসলামিয়াকে

ইজ্জত দান করেছেন, আর আমি তাদের একজন, আপনার কি এতে কোনো সমস্যা আছে? তিনি বলে, না না, আমার এতে কোনো সমস্যা নেই। কথা হচ্ছে, তিনি বাহিরে ভ্রমণ করছেন অথচ তিনি আফগানি টুপি পরিধান করে আছেন। বাহিরে ভেতরে সবখানেই তিনি এই পোষাক পরিধান করতেন, কখনো তা খুলতেন না। যখন তিনি বাহিরে গেলেন, একজন তাকে বললেন, আপনি কি তামিম আল আদনানি? হ্যাঁ। আপনি তো জর্দানি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বলল, আপনার গায়ের পোষাক তো পাকিস্তানি পোষাক? তিনি বলেন, না, এটি আফগানি পোষাক, আমি আফগান মুজাহিদ, আপনার কোনো সমস্যা আছে? তাকে বলল, না না, আসুন, আপনার পাসপোর্ট গ্রহণ করুন এবং সাচ্ছন্দে ভ্রমণ করুন; তবে অনুগ্রহ করে জাল করা থেকে বিরত থাকবেন। তিনি বলেন, আমি প্লেনে গিয়ে বসলাম, প্লেন ছাড়ার পূর্বে ইঞ্জিন চালুর পূর্বে হঠাৎ প্লেনের মাইক্রোফোনে দেখা গেল বলা হচ্ছে, তামিম আল আদনানি, হ্যাঁ, বিমানবন্দরের গোয়েন্দাকর্মী এলো এবং আমার পাসপোর্ট আবার মিলিয়ে নিল। সে বলল, আপনি সই করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবার নামলাম অফিসে প্রবেশ করলাম। তারা বলল, দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ভেতরে আছেন, কর্মকর্তার সামনে প্রবেশ করলাম এবং তাদেরকে বললাম, যথেষ্ট হয়েছে, ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করুন। বাস্তবপক্ষে আমি দানপ্রার্থী নই, না একটি ফোঁটা পরিমাণ, না দুই সাগর। এরপর তারা আমাকে বের করে দিল। আর আমার ইচ্ছা হল- আমি জিহাদ করব। তারা আমার সফর বাতিল করল। তারা তা বাতিল করেছে, আমি আর কিছুই বললাম না; তবে ভ্রমণটি আমার নষ্ট হল।

তিনি তাকে বললেন, 'আমি গতকাল আপনার একটি রেকর্ড ফিতা শুনেছি, আর আমি এখন বুঝতে পারছি, আপনি একজন মুসাফির। এখানে তিন হাজার দিরহাম আছে, আপনি এগুলো মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন!'

একেই বলে সম্মান, সম্মানের জীবন। কবি বলেন-

عش عزيزا! أو مت وأنت كريم * بين طعن القنا وخفق البنود

فرؤوس الرماح أذهب للغيظ * وأشفي لكيد صدر الحسود

জীবন কাটাবে তো প্রতাপের সঙ্গে কর,
যেখানে তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি।
বর্শার আঘাত এবং তলোয়ারের ঝলসানির মাঝে,
বর্শার অগ্রভাগ দিয়ে ক্রোধান্বিতের ক্রোধ দমিয়ে দেব
হিংসুকের বুকের চক্রান্তের পরিসমাপ্তি ঘটাব।

বর্শার অগ্রভাগ ব্যতীত মুমিনের অন্তরকে কোনোকিছুই প্রশান্ত করতে পারবে না। আমি কোন কথা থেকে কোন কথার দিকে যেতে চাই? যেখানে কুরআনে বলা হচ্ছে, وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (আর আপনি তাদের সঙ্গে উত্তম উপায়ে বিতর্ক করুন।) তাদের সঙ্গে আপনি উত্তম উপায়ে বিবাদ করুন, বুঝতে পারছেন। হাদিসে এমন একটি বিষয়বস্তু আছে, নবিজি বলেন-

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

আল্লাহ প্রতিটি বিষয়েই [ইহসান] সর্বোত্তম পন্থা রেখেছেন, যখন তোমরা কোনোকিছু হত্যা করবে, তখন উত্তম উপায়ে হত্যা করবে, আর যদি কোনোকিছু জবেহ কর, তবে উত্তম উপায়ে জবেহ কর, তোমরা তোমাদের তলোয়ারের ধারকে তীক্ষ্ণ কর এবং জবেহের পশুকে যথাসম্ভব আরাম দাও!

রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য অবশ্যই কিছু বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন। ভারি আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের কিছু ভাই জিহাদের জন্য কিছু শর্তারোপ করে, আবার কেউ ......।

সুতরাং তাদের বিমানবন্দরের কিছু পুলিশ জিজ্ঞেস করল, তাদের কেউ তোতলাতে শুরু করল এবং বলল- আল্লাহর কসম! আমি আফগানিস্তানে ছিলাম, আমি আফগান থেকে আসছি, আসুন, ভাববেন না, আমরা আপনাকে তল্লাশি করব না। জিদ্দার মধ্যে তারা একাধিক ব্যক্তি, যদিও তারা হাজিদের ক্ষেত্রে কঠোরতা করে। বলল- আল্লাহর কসম! আমি আফগানিস্তানে ছিলাম। তারা বলে, আপনার আকৃতিটা কেমন আকৃতি? সে তাকে বলল, আমি

আফগান মুজাহিদগণের সঙ্গে ছিলাম! আসুন আমরা আপনার ব্যাগ তল্লাশি করব না। দেখুন, একজন পুলিশ সে কি ভেবে দেখেছে, তার নাম ইবনু গোরিয়ুন? স্বাভাবিকভাবে সে একজন মুসলমান, সে আপনাকে ভালবাসে, ভালবাসে জিহাদকে। কিছু বড় মানুষ, যারা কিনা জিহাদকে পছন্দ করেন না, তবে তাদের মধ্যে তাদের ছোটরাই উত্তম। তাদের আচার-অভ্যাস, প্রকৃতি সুন্দর। সে আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল। সে আপনার সঙ্গে জিহাদের ময়দানে থাকার আকাঙ্খা করে।

আচ্ছা, চলুন বিষয়টি পরিস্কার করা যাক, যখন তা স্পষ্ট হবে, তাতে আপনি সাচ্ছন্দ বোধ করবেন। বর্শার মাথায় এভাবেই হয়ে থাকে একজন মুজাহিদ। মানুষেরা আপনাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তারা আপনাকে ভালবাসছে, জিহাদের কাজে সাহায্য করছে। আপনি মুজাহিদদের একটি দল নিয়ে আসছেন, আপনাকে তারা প্রাধান্য দিচ্ছে। আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, তবে আপনার শাহাদাতের কাহিনী আমাদের কাছে আরেকটি বড় দল নিয়ে আসবে। আর যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে আপনিই আরেকটি দল নিয়ে আসবেন। আপনি তো সুড়ঙ্গ-গর্তের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চান, আর আশা করেন, রুশ বাহিনীকে পরাভূত করবেন, এ তো বোধগম্য নয়!

যা হোক, নবিজি তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা করলেন, কারণ, এ যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই। তখনকার রোম যেন আজকের আমেরিকা। নবিজি ঘোষণা করলেন, আমি অতি শীঘ্রই রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হব। সেজন্য সবধরনের শক্তি বা সরঞ্জাম যোগাড় করা আবশ্যক। গণহারে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং তার জন্য উৎসাহিত করা জরুরি। তার জন্য বেশি পরিমাণে ঘোষণা ও প্রচার দরকার।

আল্লাহর কসম! আপনি যদি পাকিস্তানে আসেন, তবে আপনাকে আমি বলব- পেশোয়ার ঘুরে দেখেন; সে আপনাকে বলবে- আল্লাহর কসম ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার মোসাদের কর্মকাণ্ড শিখতে পারবেন। হায় আফসোস, তুমি তোমার জ্ঞানবুদ্ধিকে তো বিনষ্ট করেছে, তা অন্যের কাছে গচ্ছিত রেখেছ। কীভাবে চিন্তা কর যে, তুমি আল্লাহর দীনের খেদমত করবে? তুমি কিভাবে ইহুদিদের সঙ্গে লড়াই করবে, যেখানে তুমি তিন-চার হাজার মাইল দূরে বসে

থাকা ইহুদিকে ভয় কর? তুমি কাকে ভয় করছ? সে লেখাপড়া শিখতে এসেছে আর ভয় করছে যে, ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা হয়ত জেনে ফেলবে যে, সে পেশোয়ারে গিয়েছে! আমি তাকে বললাম, তোমার নাম! ভিন্ন নাম, আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষ তোমার দেশ চিনে না, তিনিই শুধু জানেন, তবে মোসাদ যদি তোমার উপাস্য হয়, তবে সে জানতে পারে!

কা'ব ইবনে মালেক বলেন, নবিজির সঙ্গে অনেক মুসলমান, তারা সৈন্যবাহিনীর জন্য কোনো রেজিস্টার জমা করে নি। কা'ব ইবনে মালেক বলেন, আপনি বলুন, কোনো একজন ব্যক্তি চায় যে, সে অনুপস্থিত হবে, সে হয়ত ভাবছে, বিষয়টি গোপন থাকবে, যতক্ষণ না কোনো ওহি নাযিল হয়। নবিজি এ যুদ্ধটি এমন সময় করেছেন, যখন সুন্দর ফলে বাগান ভরপুর, বাগানের সুশীতল ছায়ায় ঘেরা পরিবেশ। আমি এসবের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। নবিজি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন তার সঙ্গে মুসলমানরাও প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফিরে আসি, কোনোকিছুই করতে পারি না। মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি যখন ইচ্ছা তখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। এভাবে সময় গড়াতে লাগল, এমনকি মানুষেরা অব্যাহতভাবে তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করল। নবিজি যুদ্ধের পোষাকে বেরিয়ে পড়লেন, অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁর সঙ্গে আছে, তখনো আমি আমার প্রস্তুতির কিছুই করিনি। এভাবে সকাল হলো, আমি কিছুই করলাম না। এভাবে আমার সময় কেটে যেতে লাগল, তারা সবাই যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে চলছিল এবং বাহিনী এগিয়ে গেল। আমি ভাবলাম, এখনি বেরিয়ে পড়ব এবং তাদেরকে ধরে ফেলব। হায়, আমি যদি এমনই করতাম! কিন্তু আমার জন্য সৌভাগ্যের এমন কিছুই ঘটল না। আমি শহরে চক্কর দিতে শুরু করলাম, নবিজি যুদ্ধে চলে যাওয়ার পর যখন আমি মানুষের মাঝে [রাস্তায়] বের হলাম, আমি খুবই অস্থিরতা অনুভব করলাম। নিজেকে আমি একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করছিলাম, যার ওপর নেফাকের কালো ছায়া এসে পড়েছে, যে তার দীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত অথবা আমিও যেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অপরগতার কারণে অব্যাহতি দিয়েছে। নবিজি তাবুকে পৌছার আগ পর্যন্ত আমার কথা স্মরণ করেননি। নবিজি তাবুকে যখন সবার মাঝে বসে আছেন, তখন বললেন, কা'ব ইবনে মালেক এ কি করল? আমার গোত্র বনি সালমার এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর

রাসুল, তাকে তার অহংকারেই বাধা দিয়েছে। মায়ায ইবনে জাবাল তাকে বললেন, তুমি এ কী কথা বললে, এ তো খুবই মন্দকথা। হে আল্লাহর রাসুল, তার সম্পর্কে আমরা ভালই জানি। [একজন মুসলমানের উচিত সে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের হয়ে এভাবে কোনো অপবাদ প্রতিহত করা।] নবিজি মায়াযের কথা শুনে চুপ করে থাকলেন। তিনি তখনো সেভাবেই আছেন, এমন সময় এক শুভ্র ব্যক্তিকে দেখা গেল, যার কারণে মরীচিকা দূরীভূত হচ্ছে। নবিজি বললেন, সে যেন আবু খায়সামা হয়। দেখা গেল, সে আবু খায়সামা আনসারি। [আবু খায়সামা হচ্ছেন, সেই সাহাবি যিনি এই যুদ্ধে এক সা' খেজুর দান করেছিলেন, যা নিয়ে মুনাফিকরা বিদ্রূপ এবং টিপ্পনি করেছিল।]

এরপর কা'ব ইবনে মালেক বলেন, যখন আমি শুনলাম, নবিজি তাবুক থেকে ফেরার পথ ধরেছেন, আমাকে অস্থিরতায় পেয়ে বসল। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি নানা মিথ্যা কল্পকাহিনী বানাতে শুরু করলাম। আমি ভাবছিলাম, আগামীকাল যখন নবিজি মদিনায় আগমন করবেন, তখন কীভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে বাঁচা যায়। এ ব্যাপারে আমি আমার সম্প্রদায় জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের সবার থেকে পরামর্শ নিতে শুরু করলাম। যখন কেউ একজন বলল, নবিজি তো আমার থেকে অন্যায়-অপরাধ, ভ্রান্ত বিষয় দূর করার জন্যই আগমন করেছে! আমি বুঝে নিলাম, নবিজি থেকে এভাবে বাঁচার কোনো উপায় হবে না।

সুতরাং আমি সত্য বিষয়গুলোই একত্রিত করতে শুরু করলাম। সকাল বেলা নবিজি এসে পৌছলেন। নবিজির অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কোনো সফর থেকে আগমন করতেন, প্রথমে মসজিদে গমন করতেন এবং দু-রাকাত নামায আদায় করতেন। এরপর সবাইকে নিয়ে বসে পড়তেন। যখন নবিজি তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসের কাজগুলো করলেন, মুনাফিকেরা আসলো, নিজেদের ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করল, মিথ্যা শপথ করল। তারা প্রায় আশিজনের বেশি ছিল। নবিজি তাদের বাহ্যিক বিষয়গুলো গ্রহণ করলেন, তাদেরকে বাইয়াত করে নিলেন এবং তাদের জন্য এস্তেগফার করলেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলেন। এমতাবস্থায় আমি গেলাম। আমি যখন নবিজিকে সালাম করলাম, তিনি রাগমিশ্রিত মুচকি হাসি

দিলেন। এরপর বললেন, এসো। আমি হেঁটে হেঁটে তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। আমাকে তিনি বললেন, এমন কী বিদ্ধ করল যে, তা হতে বিচ্ছিন্ন হলে? তুমি কি আরোহনের জন্য তোমার বাহন ক্রয় কর নি?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আমি যদি ভিন্ন দুনিয়াদার অন্য কারো সামনে বসতাম, তবে আপনি দেখতেন যে, আমি নানা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করে তার অসন্তোষ থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিতাম। আমাকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনার ব্যাপারে যথেষ্ট সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে আল্লাহর কসম! আমি জানি, আমি যদি আজ আপনাকে মিথ্যা কথা বলি, তবে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তবে অতিসত্বরই আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অসন্তোষ বানিয়ে দেবেন। আর যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলি, তবে আপনি হয়ত তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। তবে আমি এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিদান প্রত্যাশা করি।

আল্লাহর কসম, আমার কোনো সমস্যা ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি কখনো এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং প্রশস্তির মধ্যে ছিলাম না। অথচ আমি আপনার থেকে পেছনে রয়ে গেলাম।

নবিজি বললেন, এ সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা তুমি যাও, তোমার ব্যাপারে দেখি আল্লাহ কী সিদ্ধান্ত দেন!

আমি সেখান থেকে উঠলাম, আমার সঙ্গে সালমা গোত্রের কিছু ব্যক্তিও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং আমার পেছনে পেছনে আসল। তারা আমাকে বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে পূর্বে কোনো অপরাধের কথা আমরা জানি না, তবে তুমি অক্ষম হয়ে গেলে যে, কোনো প্রকারের আপত্তির কথা নবিজির সামনে বলতে পারলে না, যেমনটা যুদ্ধে না যাওয়া ঐসব লোকেরা করল! তোমার গুনাহের জন্য নবিজির ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তারা আমাকে এভাবে দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে ফেলে দিল, এমনকি আমি ভাবলাম, আবার আমি নবিজির কাছে ফিরে যাই এবং নিজের ব্যাপারে সাজিয়ে মিথ্যা কথা বলি। কা'ব ইবনে মালেক বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আচ্ছা, আমার মত কি আরও কেউ করেছে? তারা বলল,

এমন কাজে তোমার মত আরও দু-ব্যক্তি আছে, তারা নবিজির কাছে তোমার মতই কথা বলেছে। তাদেরকেও নবিজি তোমার মতই উত্তর করেছে। আমি বললাম, তারা কারা? সে বলল, একজন হচ্ছে মুরারা ইবনে রবি আমেরি; অপরজন হচ্ছে- হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফি। কা'ব বলেন, তারা আমাকে এমন দু-জন সৎ ব্যক্তির নাম বললেন, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে অনুসরণীয় গুণ। তিনি বলেন, তাদের দু-জনের কথা আমাকে বলার পর আমি আমার পথে চলতে লাগলাম।

নবিজি মুসলমানদেরকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন, যারা কিনা যুদ্ধে নবিজির থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলাম। মানুষেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তারা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এমনকি জমিন আমার কাছে অপরিচিত মনে হতে লাগল, এ যেন সেই ভূমি নয়, যা আমি চিনি!

এভাবে আমরা পঞ্চাশটি রাত কাটালাম। আমার অপর দু-সঙ্গী তারা তো বিনীত হয়ে ঘরে বসে গেল, তারা তাদের তাদের ঘরে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে বেশি যুবক এবং শক্তিশালী। আমি নামাযে যেতাম, বাজারে বাজারে ঘুরতাম, তবে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি নবিজির কাছে আসতাম, তাকে সালাম দিতাম। তিনি হয়ত নামায আদায় করে তার মজলিসেই বসে আছেন, মনে মনে বলতাম, নবিজি কি আমার সালামের জবাব দিয়েছেন, তিনি কি তাঁর ঠোঁট নেড়েছেন? নাকি কোনো জবাবই দেন নি। (কি কথা! দেখুন, তিনি যেন শুধু নবিজির ঠোঁট নড়ার জন্য বেঁচে আছেন, আল্লাহু আকবার।) আমি নবিজির কাছেই নামায আদায় করতাম, নামাযের মধ্যে তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাতাম, এরপর যখন আমি আমার নামাযের প্রতি মনোযোগ দিতাম, অনুভব করতাম, নবিজি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আবার যখন আমি তার দিকে মনোনিবেশ করতাম, তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবে যখন আমার সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্বের সময়সীমা বেড়ে চলল, তখনকার ঘটনা: একদিন আমি হাটতে হাটতে এক দেয়ালের পাশে গিয়ে তা টপকে উপরে উঠলাম, যা ছিল আবু কাতাদার দেওয়াল, তাঁর বাগানের

দেয়াল। সে আমার চাচাত ভাই, আমার প্রিয় মানুষ। আমি তাকে সালাম দিলাম। হায়, আল্লাহর কসম, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জান, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে ভালবাসি? সে আমার একথায় চুপ করে থাকল। কোনো জবাব দিল না। আমি আবার তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তখনো চুপ, আবার আমি তাকে কসম দিয়ে বললাম, এবার সে শুধু এতটুকু বলল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তার কথা শুনে আমার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। আমি মুখ ফিরিয়ে চলে এলাম, দেয়াল টপকে বের হয়ে এলাম। আমি মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম, এমন সময় দেখি শামের একজন আগন্তুক, যে মদিনায় খাবার বিক্রি করে। সে বলছে, কা'ব ইবনে মালেক কে? তাকে কে দেখিয়ে দেবে? তিনি বলেন, মানুষেরা আমার দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিচ্ছিল। সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল এবং আমাকে একটি চিঠি দিল যা গাসসানের বাদশার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমি লেখাপড়া জানতাম, চিঠি খুলে তা পড়তে শুরু করলাম। সেখানে সে দেশের বাদশা আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে-

'আমাদের কাছে খবর পৌছুছে যে, তোমার সঙ্গী তোমাকে ত্যাগ করেছে, অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল তোমাকে ত্যাগ করেছে– আল্লাহ তো তোমাকে লাঞ্চনা এবং অপদস্থতার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের কাছে চলে এসো, আমরা তোমার মূল্যায়ন করব!'

যখন আমি এই চিঠি পড়লাম, মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর কসম, এতো আরেকটি পরীক্ষা। আমরা গাসসানের বাদশার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো ইসলামের সঙ্গে এই দীর্ঘ দিনের সংস্পর্শের পর। রাজনৈতিক আশ্রয় নেব, কার কাছে? রিগ্যানের কাছে? দীর্ঘদিনের জিহাদের পর কোথায় যাব? রিগ্যানের কাছে? একটু ভাবুন, রিগ্যান সে মুসলিম সমাজের একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সামনে নানা সুযোগসুবিধা উপস্থাপন করছে, যার সঙ্গে মুসলমানের কেউ কথা পর্যন্ত বলে না। এবার শুনুন, তিনি কি উত্তর করেন? তিনি বলছেন, আমি তা পড়ে একেও একটি পরীক্ষা মনে করলাম। আমি চিঠিটি নিয়ে চুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম, তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলাম

এবং পত্রবাহকের সামনেই চুলোয় চিঠিটি নিক্ষেপ করলাম এবং চিঠিটি জ্বালিয়ে ফেললাম।

আমাদের কাছে যদি কোনো চিঠি আসে, রিগ্যানের কাছ থেকে নয়, বুশ অথবা তার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে, এ তো ভাল, যদি আমেরিকা কোনো পুলিশের কাছ থেকেও কোনো চিঠি আসে, তবে সে তাকে চিরদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে, তারা আমাকে এমন এমন প্রস্তাব দিয়েছে, আর আমি তা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকি!

কা'ব ইবনে মালেক ﷺ বলেন, আমি চিঠিটি চুলোয় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে ফেললাম। এভাবে যখন পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ওহি অবতরণ বিলম্বিত হতে শুরু করল, এর মধ্যে একদিন আল্লাহর রাসুলের দূত ও সংবাদদাতা আসল। সে এসে আমাকে বলল, আল্লাহর রাসুল আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আমি কি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেব, নাকি কী করব? সে বলল, না শুধু পৃথক থাকুন, তার কাছে যাবেন না!

আমার অপর দুই সঙ্গীর কাছেও এমন আদেশ পাঠানো হল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাবার পরিবারে চলে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ এ বিষয়টি পরিস্কার করেন। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী নবিজির কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, হেলাল ইবনে উমাইয়া একজন বয়স্ক এবং দুর্বল মানুষ, তাঁর কোনো সেবক, খাদেমও নেই। আমি তার খেদমত করাকে কি আপনি অপছন্দ করবেন? নবিজি বললেন, না, তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তার তো কোনোকিছুর প্রতি আকর্ষণই নেই। আল্লাহর কসম, তিনি তো প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কেঁদেই চলছেন....

আমার ব্যাপারে এবং আমার ওপর দুই সঙ্গী যাদের ওজর গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে নবিজি সিদ্ধান্ত যা ছিল, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা এরপর কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।' কেননা যে বিষয়টি কা'ব এবং তার মত

অন্যদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তা হচ্ছে, সত্য। আর তাই, আল্লাহ তায়ালা সত্য বলতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর জিহাদ সত্য এবং নিষ্ঠার প্রতি মুখাপেক্ষী। জিহাদের জন্য এ দুটি বিষয় প্রয়োজন। প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠ নিয়ত। তুমি আল্লাহর অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত কর, তবে আল্লাহও তোমাকে সত্যায়িত করবেন।

নবিজি একবার গণিমতের মাল বণ্টন করছিলেন, তখন তিনি এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন, নাও! সে বলল, আমি এর কারণে আপনার অনুসরণ করব না, আমি আপনার আনুগত্য করব এর ওপর যে, আমি এখান থেকে যাব এবং লড়াই করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করব। নবিজি আরেকটি যুদ্ধে গেলেন, তাঁকে তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাকে তিনি নিহতদের মাঝে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবাগণ বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ। নবিজি বললেন, সে আল্লাহর সঙ্গে সত্য ওয়াদা করেছে, আল্লাহও তাঁকে সত্যায়ন করেছেন। যখন তোমরা আল্লাহকে সত্যায়ন করবে, তিনিও তোমাদেরকে সত্যায়ন করবেন। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠভাবে শাহাদাতের আকাঙ্খা করে আল্লাহ তাকে তা দান করেন, যদিও সে বিছানার ওপর মৃত্যুবরণ করে।

সত্য, জি ভাই, সত্য এমন এক বিষয়, যার কারণে মানুষ আপনাকে সম্মান করবে। আর মিথ্যা আপনাকে মানুষের চোখ থেকে নামিয়ে দেবে। সত্য একটি হৃদয় থেকে আরেকটি হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়। সত্য আপনাকে বিস্তর শান্তি দেবে। আর মিথ্যা করবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। মিথ্যার আয়ুস্কাল হচ্ছে স্বল্প এবং নিকটবর্তী এবং তার সময়ও কম। অতিসত্বর তা মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাবে আর আপনি মানুষের সমাজে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। না, আপনি বরং সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী হতে চেষ্টা করুন, জটিলতা এবং অস্পষ্টতা থেকে দূরে থাকুন। আসল বিষয়টি ঘুলিয়ে ফেলবেন না। ঠিক আপনি বরং আপনার নেতার সঙ্গে সত্যবাদী হোন। আপনার ভাই ও বন্ধুর সঙ্গে অবস্থান স্পষ্ট রাখুন। সত্যবাদী প্রশান্তি পায়, সত্যবাদীকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহ মিথ্যাকে ঘৃণা করেন, যদিও তা ঠাট্টা-মস্কারা করেই হোক না কেন।

আবু দাউদ শরিফে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে-

وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

'যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। তার জন্য আবারও ধ্বংস।'

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

যে ব্যক্তি ঠাট্টাবশতও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থেকেছে, তার জন্য আমি জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘরের দায়িত্ব নিলাম।

অতএব, সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে তার অঙ্গীকারে সত্যায়িত করবেন। জিহাদের জন্য সত্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আশা ব্যক্ত করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

অষ্টাত্রিংশ মজলিস

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ
سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

‘মুমিনদের সবার জন্য একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সমুচিত নয়। তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না, যেন তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং নিজের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে; যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে, যেন তারা সতর্ক হয়।

হে ঈমানদারগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন।

যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এর দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল?’ যারা মুমিন; এ আয়াত একমাত্র তাদের ঈমানই বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে [কুফর, শিরক, নিফাক এবং বিদআতের] ব্যাধি রয়েছে, এসব আয়াত তাদের পূর্বের

কলুষের সঙ্গে আরও কলুষ বৃদ্ধি করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

তারা কি দেখে না, তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দুই বার বিপর্যস্ত করা হয়?' তারপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের প্রতি কেউ লক্ষ করেছ কি?' অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই।

নিশ্চয় তোমাদের থেকেই তোমাদের নিকট রাসুল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপর তারা যদি বিমুখ হয়, তবে আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।' [সুরা তাওবা: ১২২-১২৯]

এ আয়াতগুলো হচ্ছে সুরা তাওবার সর্বশেষ আয়াত। আর সুরা তাওবাতে আল্লাহ তায়ালা তিনজন সাহাবির তাওবা কবুলের ঘোষণা করেছেন, তাদেরকে দায়মুক্তি দিয়েছে, অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নবির অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও। যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, খোদাপ্রেমের এ এক অনন্য সাক্ষীও বটে, তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিয়েছেন।

হায় প্রশান্তি! এ কত বড় নেয়ামত, এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে যে, একজন মানুষ পৃথিবীর জমিনের ওপর হাঁটছে আর তার পকেটে তখন চারিত্রিক সার্টিফিকেট রয়েছে যে, তার ব্যাপারে ওহি অবতীর্ণ হয়েছে, তার তাওবা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকানো হয়েছে, আর সে একজন সত্যবাদী জান্নাতবাসী! এর চেয়ে আর বড় নেয়ামত কী হতে পারে? এরচেয়ে বড় সম্মান আর মর্যাদা কী হতে পারে?

আমাদের কারও কাছে যদি প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে একটি চিঠি আসে, অথবা কোনো মন্ত্রীর একটি চিঠি আসে; তবে তাকে মোড়কে মুড়িয়ে নেয়, তার ছবি তোলে, তাকে সযত্নে তুলে রাখে, কী বিষয়? অমুক রাষ্ট্রপ্রধান, বাদশা বা মন্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট পেয়েছে! আর এখানে সম্মাননা ক্রেস্ট এসেছে রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে, মহাপরাক্রমশালী, মর্যাদা ও সম্মানের যিনি একমাত্র অধিপতি, তার পক্ষ থেকে। আর তা নিয়ে এসেছে, ফেরেশতাদের সর্দার জিবরাঈল ﷺ, নবিদের সর্দার মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে, তিনি যেন তাদেরকে এ সুসংবাদের মুকুট পৌঁছে দেন যে, আমি তাদের তাওবা গ্রহণ করে নিয়েছি। মানুষ এ সম্মাননা ক্রেস্ট কোথায় রাখবে! কিভাবে তার মোড়ক লাগাবে! একে কি ঘরের দরজার সামনে রাখবে, না তার অন্তরের মাঝে, নাকি নিজের মাথার ওপর? আপনি আমার ভাবনার সঙ্গে একটু এক হতে চেষ্টা করুন, একজন মানুষ সে জমিনে হেঁটে চলছে, যে জানে সে একজন জান্নাতবাসী ব্যক্তি! এরচেয়ে বড় নিয়ামত কী হতে পারে? কী নেয়ামত আছে আর? এরচেয়ে তো আর বড় কোনো নেয়ামত নেই। আল্লাহ্ কুরআনে বলেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

‘আপনি বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহে, তার একান্ত দয়ায়, আর তার কারণেই তো তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।’ [সুরা ইউনুস: ৫৮]

এখানে বর্ণিত প্রথম আয়াতে মুমিনদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা সবাই জিহাদে বের হবে না। তারা দু-ভাগে বিভক্ত হবে, একদল তারা তাদের বাড়ি এবং শহরেই থাকবে, আরেকদল যুদ্ধে বের হবে। তবে এই আদেশও হবে তখন, যখন সেখানে আক্রমণাত্মক জিহাদ হবে, আত্মরক্ষামূলক জিহাদে নয়। কারণ, জিহাদ দু-প্রকারের:

১. এমন কোনো কাফেরের উদ্দেশ্যে বের হব, যারা তাদের দেশেই আছে, তাদের ওপর গিয়ে আক্রমণ করব, এ হচ্ছে আক্রমণাত্মক জিহাদ, এ প্রকারের জিহাদ হচ্ছে ফরজে কিফায়া। তবে এমন যুদ্ধেও ইমাম যদি গণহারে বের হতে বলেন, যেখানে ইমামের লক্ষ হচ্ছে কাফেররা তাদের

সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করছে, তাই তাদের সঙ্গে তাদের সীমান্তেই মিলিত হবেন, তাদেরকে আটকে দিবেন, প্রতিহত করবেন, তবে এমতাবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। কারণ, ইমাম সবাইকে বের হতে আদেশ করেছেন এবং কাফেরদের ঝুকিপূর্ণ এলাকায় জমা হওয়ার কারণে। যেমনটি হয়েছিল তাবুক যুদ্ধের মধ্যে।

২. আরেক প্রকারের যুদ্ধ হচ্ছে, প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। যখন কাফেররা আমাদের কোনো মুসলিম দেশে প্রবেশ করে। এ প্রকারের জিহাদ হচ্ছে ফরজে আইন। এখানে মুসলিম উম্মাহের সবাইকে জিহাদের জন্য বের হতে হবে, যারা কিনা যুদ্ধ-এলাকার নিকটবর্তী। যখন তারা কাফেরদের উদ্দেশ্যে বের হবে মুসলমানদের মর্যাদা এবং সম্পদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কাফেরদের বিরুদ্ধে, তবে এমতাবস্থায় অন্য মুসলমানের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। যদি তারা প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, অথবা তারা চুপচাপ বসে থাকে, যেমন আরবরা ১৯৭৬ সালে করেছে। তারা বরং এই চেষ্টা করেছে যে, বিষয়টিকে তারা জাতিসঙ্ঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সমাধান করবে। তারা চেষ্টা করেছে যে, ইহুদিরা ইহুদিদের বৈঠক আর পরামর্শেই ফিরে যাবে। কারণ, জাতিসঙ্ঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে ইহুদিদেরই খেলার একটি অংশ, যার মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মানবিক নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। দখলকৃত মানুষেরা যখন আরবদের মতই করল, যেমনটা তারা ১৯৭৬ সালে করেছে। তারা বলেছে- আমরা তাদেরকে শান্তি আলোচনা এবং চুক্তির মাধ্যমেই ফিরিয়ে দেব, এমতাবস্থায় যারা অনারব রয়েছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে- ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করা। অর্থাৎ যখন মিশর, সিরিয়া, জর্দান যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছে, তখন সৌদিবাসী এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করা ওয়াজিব। যখন সৌদি এবং উপসাগরীয় মুসলমান বসে থাকবে, তখন বিষয়টি ব্যাপক হয়ে পাকিস্তান, আফগানের মানুষের জন্য আবশ্যক হবে, যখন তারাও বসে থাকবে, তখন এর পরের ইন্দোনেশিয়া, পূর্বাঞ্চল এবং ফিলিপাইনের মানুষের জন্য ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করা ওয়াজিব হবে। যখন তারাও বসে যাবে, তখন বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফিলিস্তিনে এসে তা ইহুদিদের দখল থেকে তা মুক্ত করা ফরজে আইন হয়ে যাবে। যেমন নামায এবং রোযা ওয়াজিব।

আর এ কারণেই (মুমিনদের সবারই বের হয়ে যাওয়া সমিচিন নয়) যখন মুসলমানেরা তাদের দেশে নিরাপদ হবে, মুসলমানদের সকল দেশ প্রাচুর্যে পূর্ণ হবে, তখন তারা যে যুদ্ধ করবে, তাকে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলা হবে, তখন জিহাদ হবে ফরজে কিফায়া। ফরজে কিফায়া তবে কী জিনিস?

আলেমগণ বলেন- ফরজে কিফায়া হচ্ছে, মুসলমানদের নেতা বছরে একটি দলকে কাফেরের দেশে একবার বা দুই বার আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন। এ হচ্ছে ফরজে কিফায়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর যদি মুসলমানদের ইমাম অথবা নেতা কাফেরের দেশে আক্রমণের জন্য দু-একবার না পাঠায়, তবে তিনি এবং তার সঙ্গে সমস্ত উম্মত গুনাহগার হবে। কারণ, ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব উম্মতের ওপর থেকে উঠে যায় নি।

অর্থাৎ আরবদের জন্য আবশ্যক বা ওয়াজিব হচ্ছে, ইসলামি প্রতিটি দেশ যদি মুসলমানদের হাতে থাকে, যদি উন্দুলুস মুসলমানদের অধীনে থাকে, বুখারা, তাসকান্দ, তাজেকিস্তান, কাফকাশ এবং সাইবেরিয়াসহ মুসলমানদের প্রতিটি জনপদ যদি নিজেদের আয়ত্বে থাকে এমনকি রোম সাগর, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া মুসলমানদের অধীনে থাকে এবং তা ইসলামি বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে আরবের মুসলমানদের জন্য বছরে একটি অথবা দুটি সৈন্যদল বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানের দিকে একবার বা দু-বার পাঠানোর দ্বারা ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব পালন হবে। নতুবা সমস্ত উম্মতই গুনাহগার হবে, বুঝতে পেরেছেন, এই হচ্ছে ফরজে কিফায়া!

তবে এই বিধান তো তখন, যখন বিশ্বের সবকটি ইসলামি দেশ মুসলমানদের হাতে থাকবে, তাদের আয়ত্বে ও কর্তৃত্বাধীন থাকবে।

আর যদি ইসলামি ভূমির এক বিঘত জায়াগায় খোয়া যায়, কেউ দখল করে নেয়, তবে তার বিধানই সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। এমতাবস্থায় কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ। আর আত্মরক্ষামূলক লড়াই করা ফরজে আইন। ফরজে আইন হবে আক্রান্ত এলাকার মুসলমানদের ওপর, যতক্ষণ না তারা কাফেরদের তাদের ভূমি থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয়। আর তারা জিহাদ না করে যদি বসে থাকে, অলসতা করে বা তারা সংখ্যায়

কম হয়, তবে এই ফরয বিধানটি ব্যাপক হয়ে যাবে, তখন এ দায়িত্ব তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের জন্যও আবশ্যক হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে চলতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই ফরয হয়ে যাবে, যতক্ষণ না তারা তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে। তাদেরকে পরাজিত করতে পারে। ফরজে আইনের অর্থ হচ্ছে, জিহাদ তখন নামায, রোযা, হজ, যাকাতের মতই ফরজ হয়ে যাবে। পূর্বে ফরজে কিফায়ার আলোচনায় ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি সে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ এবং ঠাণ্ডার মধ্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তবে সে ভয় করছে, হয়ত তার কোনো ফরজ নামায ছুটে যেতে পারে, তবে কি সে জিহাদ করবে, না বসে থাকবে? তিনি তার উত্তরে বলেন, সে লড়াই করবে। তার জন্য লড়াই করা উত্তম।

এক ব্যক্তি চাচ্ছে লড়াই করার জন্য, যখন তার জন্য জিহাদ ফরজে কিফায়া। এ ব্যক্তি হজ করে নি, তবে কি সে হজ করবে, নাকি লড়াই জিহাদ করবে? তিনি বলেন, তার জন্য হজ আদায়ের পূর্বে জিহাদ করতে কোনো সমস্যা নেই। যখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করবে, বিজয় দান করবেন, তখন তিনি হজ আদায় করে নেবেন। অথচ ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাব অনুসারে হজ ফরজ হওয়ার পরপরই তা আদায় করা জরুরি। আর এ কারণেই বলব, জিহাদের ফরজে আইন বিধান সর্বপ্রথম সে দেশের ওপর সাব্যস্ত হয়, এরপর ক্রমান্বয়ে তা অন্যদের ওপরও ছড়িয়ে পড়ে।

সে তো ছিল ফকিহগণের সময়কাল, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আবেদিন শামি, ইমাম নববি, শায়খ রমলি, ইবনুল জাইন এবং ইবনে মাফলাহের সময়কাল, এমন যুগ যেখানে পশুর ওপর সাওয়ার হয়ে যাতায়াত করতে হতো। এমন যুগ যেখানে একদিন, দুদিন বা তিনদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। আর আজ একেকটি যুদ্ধ দশ বছরব্যাপী দীর্ঘ হচ্ছে, বিমানগুলো একদিনেই পুরো বিশ্বের চারপাশ চক্কর দিয়ে আসছে, পুরো ইসলামি বিশ্ব একখণ্ড জমির ন্যায়। ফরজে আইনের এ বিধানের ক্ষেত্রে কে কাছে, কে দূরে, কে মিশরে বসবাস করে আর কে ফিলিস্তিনে, কে ইন্দোনেশিয়ায় বসবাস করে আর কে আফগানে বসবাস করে এখন আর এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করার কোনো প্রয়োজন আর নেই। সবার জন্য সবদেশই এখন একেবারে হাতের তালুর

ন্যায়। যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় যাওয়া সম্ভব। দুদিনের মধ্যেই আপনি আফগানে পৌঁছে যেতে পারেন। পাকিস্তানে আসতে একদিন আর পরের দিনই আপনি আফগানে চলে যেতে পারেন। শুধুমাত্র রাশিয়া আফগানে প্রবেশের মাধ্যমেই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে।

আমাদের জন্য জিহাদ এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, তার বিধান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে একদিন আমি ফাতওয়া প্রকাশ করলাম যে, জিহাদ এখন ফরজে আইন হয়ে গেছে, দেখলাম অনেক উলামায়ে কেরাম এ নিয়ে অভিযোগ তুলছে, এতে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এক পা এগোই তো এক পা পেছোই।

একবার আমি এই ফাতওয়াটি শায়খ বিন বাযের কাছে উপস্থাপন করলাম। শায়খ ফাতওয়াটি পড়লেন এবং অন্যান্য কিতাবাদি থেকে তা যাচাই করলেন। তিনি বললেন, আপনার কথা তো সঠিক এবং অনেক উত্তম। আপনি বিষয়টিকে সংক্ষেপ করে নিয়ে আসুন, আমি এর ওপর স্বাক্ষর করে দিচ্ছি, আপনি তা প্রকাশ করবেন। এরপর আমি হজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শায়খ চলে গেলেন রিয়াদে। আমি পাকিস্তান ফিরে আসলাম। কিন্তু আমি তা সংক্ষেপিত করার পর শায়খ ইবনে উসাইমিন, শায়খ উমর সাইফ, শায়খ মুহাম্মদ নাজিব মুতিঈ, সাঈদ হাবি রহিমাহুল্লাহকে পেয়ে যাই। আমি তাদের সামনে ফাতওয়াটি পাঠ করে শোনালাম। তারা ফাতওয়া শুনে খুবই আশ্চর্যন্বিত হলেন এবং তাতে তারা স্বাক্ষর করলেন যে, জিহাদ এখন ফরজে আইন হয়ে গিয়েছে।

এ ছিল প্রথম প্রদক্ষেপ এবং পরিকল্পনা, যা আমরা বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য গ্রহণ করেছিলাম যে, বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ুক। যদি বিষয়টি একজন ব্যক্তি শুধু দেখেও যায়, তবে তা তার বিবেককে নাড়া দেবে। এ ছিল বিশাল এক পরিকল্পনা। কারণ, মানুষেরা তখন পর্যন্ত মনেই করত না যে, জিহাদ নামায, রোযা এবং হজের মতই ফরজ বিধান। বরং জিহাদ তো নামায, রোযা এবং হজের চেয়ে আরও বেশি অগ্রগামী, গুরুত্বপূর্ণ। যেমনটি ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন- যে চেপে বসা শত্রু মুসলমানের দীন-ধর্মকে

নষ্ট করে দেয়, ঈমানের পর তাকে দমন করার চেয়ে বড় কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রথমত: এই সাক্ষ্য দেবে যে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এরপরের দায়িত্ব হচ্ছে জিহাদ। তারপর নামায, রোযা এবং হজ। জিহাদ শুধু আফগানেই ফরজ নয়। জিহাদ তো উন্দুলুসের পতনের পর থেকেই সে দেশের অধিবাসীদের ওপর এবং এরপর পর্যায়ক্রমে পুরো উম্মতে ইসলামিয়ার সবার জন্যই ফরজ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং ১৪০০ সালের পর থেকে আজ ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ছয়শত বছর যাবত জিহাদ উম্মাতে মুসলিমার সবার জন্যই ফরজে আইন। যদি তারা জিহাদ না করে, তবে সবাই গুনাহগার হবে। আর এ কারণেই জিহাদ ফরজে আইন হচ্ছে প্রতিরক্ষা বা আত্মরক্ষামূলক জিহাদ অর্থাৎ, শত্রুকে মুসলমান এবং মুসলমানদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা। যতদিন পর্যন্ত কাফেররা মুসলমানদের ভূমিতে চেপে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম জনগণের জন্য জিহাদ ফরজে আইন। যদি সবাই বসে থাকে, তবে তোমাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ কুরআনে তাঁর নবিকে উদ্দেশ্য করে আদেশ করছেন-

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ.

'আর আপনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুন, আপনি শুধু আপনার নিজের জন্যই বাধ্যগত, তবে মুমিনদেরকে আপনি উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন।' [সুরা নিসা: ৮৪]

সুতরাং আমরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখছি, তিনি আমাদের দুর্বলতা, স্বল্প উপায়-উপকরণ এবং শূণ্যহাত হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন, বিজয় দান করবেন এবং আমাদেরকে তিনি অটল-অবিচল রাখবেন। আমরা মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকব। আপনি কি ভেবেছেন, মানুষকে আপনি আফগানিস্তানে একত্রিত করবেন? আপনি ভেবেছেন, দীনের দাঈদেরকে

আফগানের ভেতরে হত্যা করবেন? আপনি ভেবেছেন, ইসলামি বিশ্বের যেসব সন্তানদেরকে আমেরিকা এবং রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত করেছি, তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন? আফগানিস্তানে এখন কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন নেই!! আফগান এখন কিছু লোকের প্রতি মুখাপেক্ষী, যদিও অনেকেই এই কথা বলে যে, আফগানে এখন টাকার চেয়ে বহুগুণে ব্যক্তির প্রয়োজন।

এখানে যুবকেরা এখন সতর্ক হতে শুরু করেছে, প্রচারের যন্ত্র এখানে বর্তমানে এমন- যা বিশ্বাস করা মুশকিল, যেমনটা পশ্চিমাদের প্রচার মাধ্যম রয়েছে, তার সমান। এ লড়াই তো রুশ এবং অস্ত্রহীন কিছু জাতিগোত্রের সঙ্গে।

একজন নেতাও যেমন বলেছেন, যাকে শায়খ সাইয়াফ আফগানের জিহাদ সম্পর্কে, সেখানের বিজয় ও সাহায্য সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, সে নেতা অট্টহাসি দিয়ে বলেছিলেন, তোমরাই কি রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করবে? না না, তোমরা এ রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে না, এ কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তার জ্ঞানে এ কথা কোনোক্রমেই বোধগম্য হচ্ছিল না যে, একজন মুসলমান কাফেরের মুকাবিলা করতে পারে! সে মূলত এ কথাই মানছিল না যে, আল্লাহ্ সবার চেয়ে শক্তিশালী, রাশিয়ার চেয়ে শক্তিশালী। এসব ব্যক্তিরা মূলত মানতেই চায় না যে, আফগানের বর্তমান জিহাদ রাশিয়া-আমেরিকা ও তাদের দোসরদের সব বলয় উল্টে দিয়েছে। এখন তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অনুসারীদের দোসর এবং মিত্ররা রাশিয়ার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, শুধু তাদের সামনেই দাঁড়ায়নি; বরং তাদেরকে প্রতিহত করেছে, লাঞ্ছিত করেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-এর দোসররা আমেরিকা এবং রাশিয়াকে চমকে দিয়েছে, হতভম্ভ, হতবাক করে দিয়েছে। যখন আফগান জিহাদ শুরু হল, আমেরিকা তখন আনন্দের অতিশয্যে হাত তালি দিচ্ছিল। তারা ভেবেছিল, এবার আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানের প্রতিহিংসা থেকে একটু দম নেব। তারা বলেছিল, রাশিয়া এবার ফাঁদে পড়েছে। আমরা কোনো মজবুত, শক্তিশালী জাতি পাচ্ছি না, যারা রাশিয়ার সামনে দাঁড়াতে পারে, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে, তার মর্যাদা ধূলিস্যাৎ করতে পারে। প্রকৃতই যদি তাদের কোনো

সম্মান থাকে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পরিভাষায় আমাদের দেশে তাদের যদি কোনো বলয় থাকে– এমন কোনো জাতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা এই বলয় ভাঙতে পারে, যেমনটা আফগান জাতিগোষ্ঠী পারে। আফগান জাতি জানে, যারা তাদের পাহাড়সমূহে আরোহন করেছে তারাই পরাজিত হয়েছে, তারা রাশিয়াকে নামিয়েছে, প্রাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য সবাইকে তারা পরাভূত করেছে, তা কি বিশ্বাস করা যায়?

কিছু সাংবাদিক এসেছিল ফ্রান্সসহ কিছু দেশ থেকে বানজিশোর অঞ্চলে। তারা সেখানে আহমাদ শাহ মাসউদকে দেখল, সে রাশিয়ার ট্যাংকগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছে। একটি যুদ্ধেই সে ৪০/৫০ টি ট্যাংক ধ্বংস করে দিচ্ছে। তার মাথার ওপর রাশিয়ার তিনশত যুদ্ধ বিমান উড়ছে। তার সামনে প্রায় পাঁচশতাধিক ট্যাংক, আর সে হালকা কিছু অস্ত্র নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেসব ফ্রান্স এবং পশ্চিমা সাংবাদিকেরা ফিরে গেল এবং লিখল, 'আফগানিস্তানে আমরা আল্লাহকে দেখেছি!'

সাম্যবাদ-কমিউনিজমও আফগানের অভ্যন্তরে একজন ইতালিয়ান ক্যাথলিক সাংবাদিক প্রেরণ করে, সে যুদ্ধের নানা খবর আদানপ্রদান করত। সে যখন দেখল, মুজাহিদগণকে বিমান আক্রমণ দ্বারা পিষে ফেলা হচ্ছে, আধুনিক যুদ্ধবিমান দ্বারা, যা কিনা মনুষ্যজ্ঞান আবিস্কার করেছে, দিনের লম্বা একটি সময় তারা মুজাহিদগণের ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। সে বলে, আমি একটি ক্যাম্পের ধ্বংসস্তুপের নিকট আসলাম, আমি তো ভেবেছিলাম, এর ভেতর যা আছে, তার সবই ধ্বংস হয়েছে, এখানের কেউ বেঁচে নেই, সবাই মাটির নিচে দাফন হয়ে গেছে। সে বলে, আমি আক্রমণের পর একজনকেও শহিদ পেলাম না। সে বলে, আমি দেখতাম, কিছু সাদা পাখি বিমানগুলোর নিচে উড়ছে। এই তো ইতালিয়ান ক্যাথলিক সাংবাদিক, অর্থাৎ সে একই সঙ্গে ক্যাথলিক, ইতালি আবার সাম্যবাদের একজন প্রতিনিধি। সবধরনের মন্দই তার ভেতর ছিল, সে ফিরে গেল এবং ইসলামি একটি টেলিভিশনের সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করল। তিনি বলেন- আমি দেখেছি আফগানে বোমারু বিমানগুলোর নিচে কিছু পাখি মুজাহিদগণের হয়ে বিমানের আক্রমণ প্রতিহত করছে। টেলিভিশনের ভাষ্যকার আরবের মতই বোঝে!! সে বলল, আপনি কি এসব বিশ্বাস করেন? সে বলল, আমি আমার চোখকে মিথ্যা

বলতে পারি না। তবে আপনার ব্যাপারটি ভিন্ন, আপনি তাকে সত্য বলেন আর মিথ্যা বলেন, সবই এক। আমাদের নিকট তা ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মতই। এমনকি বর্তমানে পশ্চিমা সাংবাদিকরা লিখে- 'মুজাহিদরা' করেছে....., আর কুয়েতি সাংবাদিকরা লিখে, 'বিদ্রোহীরা করেছে....' জি শায়খ, তারা অনেক বেশি বোঝে! তারা দীর্ঘদিন যাবত বুদ্ধিজীবী!! আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। আল্লাহ যদি চান, তবে তিনি তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। আর এ কারণেই বুঝি কুয়েত তাদের সেখানে ইসলামি সম্মেলন শেষে রাশিয়াকে আড়াইশত ডলার অনুদান দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে ব্যাংকিং সহায়তার নামে। যেন তারা নতুন নতুন আরও বড় বোম তৈরি করতে পারে আফগানের মুসলমানদের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য। যার মাধ্যমে শত শত মুসলমানকে জবাই করা যাবে।

এ মাসে তারা রাশিয়ান ব্যাংকিং সহায়তার নামে একটি চুক্তি সই করেছে। এটি নতুন চুক্তি, যা রাশিয়া এবং কুয়েতের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে, তারা নতুন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করেছে। আরবি বিশ্ব আরবি ইমারাতসহ অন্যান্যরা আপনাকে বলবে, 'স্ট্যাঞ্জার! আমেরিকা এবং অন্যান্যদের ব্যাপারে, সাবধান!'

হে সম্ভ্রান্ত সন্তানেরা, তোমরা শুধুমাত্র ফ্রান্স-বৃটেনের সাংবাদিকদের মত নিজেদের দায়িত্ব পালন কর। ইতালির এসব সাংবাদিকদের ন্যায় আফগানে প্রবেশ কর। ফিরিঙ্গি সেসব মেয়েদের মত নিজেরা একটু দায়িত্ব পালন কর। ফিরিঙ্গি এসব মেয়েদেরকে তুমি বরফের নিচে পাবে। তারা এখানে বরফের কষ্ট সহ্য করছে শুধু খৃষ্টীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য। তার সেবা করার জন্য অপরাধীদের ব্যান্ডেজ করছে। অপরদিকে খবর পরিবেশন করছে।

আমি ফ্রান্স থেকে আগত এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি আফগান সীমান্তে, সেখানে সে চার মাস অবস্থান করেছে। আমি তাকে বললাম- আপনি এখানে চারটি মাস কীভাবে অবস্থান করতে পারলেন? সে বলল- এ তো খুব সোজা। সকালের নাস্তা চা এবং রুটি, দুপুরের খাবার রুটি এবং চা।

সে বলল, প্রকারে পরিবর্তন এসেছে। কারণ, সকালে রুটি এবং চা আর দুপুরে চা এবং রুটি!! আর বলছে, এ তো খুব সোজা!!!

আমি তাকে বললাম, কী দেখতে পেলেন?

সে বলল, অতিশীঘ্রই আফগান জাতি বিজয় পেতে যাচ্ছে। কারণ, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী। একটি বিষয়ের তারা প্রতিহতকারী। সূচনাকারী। আর রাশিয়া সে কার পক্ষ হয়ে লড়াই করবে? এ তো এমন যে, সে যে ক্যাম্পে ছিল, সেখানেই গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে, আর সম্মানের বিষয় তো এই যে, সে ছাড়া কেউ আহত হয় নি, জি, ঠিক তাই!

এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে- আরব বিশ্বের পত্রিকাগুলি, তারা একদিন খবর প্রচার করছে এবং বিষয়টিকে তারা এমন বানিয়েছে যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মাঝে তারকাদের লড়াই। তারা কত সুন্দর বোঝে! মাশাআল্লাহ!

বড় অসহায় এসব সাংবাদিকরা। হায়! তারা যদি এ ঈমান রাখত যে, আল্লাহ হচ্ছেন শক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী। হায়! তারা যদি বুঝত যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তিনি রাশিয়া আমেরিকার চেয়ে শক্তিশালী। হায় তারা যদি বিশ্বাস করত, যা আল্লাহ বলেছেন-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.

'আসমান আর যমিনে এমন কোনোকিছু নেই, যা আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান।' [সুরা ফাতির: ৪৪]

তারা এ কথা মানতেই চায় না যে, রাশিয়ান ট্যাংক, হেলিকপ্টার এবং বোমারু বিমান মাত্র তিন দিন আগেই মুজাহিদগণ ক্লাশিনকোভের মাধ্যমে জাজি এলকায় ভূপাতিত করেছে। হ্যাঁ, ক্লাশিনকোভের মাধ্যমে হেলিকপ্টার নামিয়েছে। এতো বুলেটপ্রুফ হেলিকপ্টার যা তারা গুলি করে ভূপাতিত করেছে!!

আমাকে এক ব্যক্তি বলেন, কাবুলে আমাদের ওপর বিমান আক্রমণ শুরু হল। আমরা কাবুলের দক্ষিণের একটি এলাকা কারিতে ছিলাম। আমাদের ওপর বিমান আকমণ শুরু হলে আমরা সবাই আত্মগোপন করলাম, তবে এক বৃদ্ধ শায়খ, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বিমানটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন এবং কাঁদছেন আর দুআ করছেন, হে আল্লাহ, কে শক্তিশালী, তুমি, নাকি এই বিমান? একে কি আমাদেরকে ধ্বংস করতে পাঠিয়েছ? হে আল্লাহ, কে সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী, কে ক্ষমতাবান, তুমি নাকি এই বিমান? হে আল্লাহ, কে শক্তিশালী, তুমি নাকি রাশিয়া? তুমি তাদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছ? তিনি এভাবে দুআ করছিলেন এবং আকাশের দিকে ইশারা করছিলেন। মুহাম্মদ সিদ্দিক কারি বলেন, [তিনি তার কথাতেও সত্যবাদীই হবেন, বলে আমরা মনে করি।] আল্লাহর কসম, সে তাঁর হাত তখনো নামায় নি, তার আগেই বিমানটি ভূপাতিত হল, জি শায়খ, শুধু দুআর মাধ্যমেই একটি বিমান ভূপাতিত হল। তোমার প্রতিপালকের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমার ভাইয়েরা, আমি বলতে চাই, জিহাদ তো ফরজে আইন হয়ে আছে, ছয়শত বছর আগে যখন থেকে স্পেনের উন্দুলুসের প্রথম শহরটি ফার্ডিন্যান্ড এবং ইসাবেলার হাতে পতন হয়েছে। আর তা এভাবে ফরজই থাকবে, যতক্ষণ আবার ইসলামের প্রতিটি অঞ্চল মুসলমানদের হাতে ফিরে আসবে এবং তার ওপর ইসলামের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ঝাণ্ডা পতপত করে উড়তে থাকবে।

সুতরাং সমস্যাটি শুধু আফগান এবং ফিলিস্তিনের নয়। যদিও তা ইসলাম ও মুসলমানের প্রধান সমস্যা। যদিও ফিলিস্তিন ইসলামি বিশ্বে প্রথম সমস্যা। তবে যুদ্ধ এখন আফগানের অভ্যন্তরেও শেকড় গেড়ে বসেছে। তার সর্বত্রে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই, আমরা আফগানে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে এবং তাঁর শত্রুর মাঝে কোনো ফায়সালা না করেন বা আমাদেরকে বিজয় দান করেন। আমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পারব। এরপর বিষয়টি এখানেই শেষ হবে না, এর দ্বারা ফরজে আইনের বিধানও রহিত হয়ে যাবে না। এরপর

আমরা প্রত্যাবর্তন করব আকসা এবং বাইতুল মাকদিসের দিকে, ইনশাআল্লাহ। সেই বরকতময় ভূমিতে। অথবা অন্যকোনো জায়গায়। এভাবে আমরা তা চালিয়েই যাব।

জিহাদের ফরজিয়্যাত বা আবশ্যকীয়তা এখন সেই নামায এবং রোযার মতই। নামায যেমন একজন মানুষ থেকে মৃত্যু ব্যতীত মাফ হয় না, তেমনিভাবে একটি ফরজে আইনের বিধানও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রহিত হয় না। জি, একজন মানুষের জন্য যেমন রোযা রাখা ফরজ, যতক্ষণ না সে আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়, বা সে রোগাক্রান্ত হয়, যেমনিভাবে একজনের নামায কখনোই মাফ হয় না, সে যেমনই অসুস্থ হোক না কেন, তেমনিভাবে জিহাদের ফরজ দায়িত্বও রহিত হয় না, যদি না তার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়। যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.

'কোনো অন্ধ, অচলাঙ্গ এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কোনো সমস্যা নেই।' [সুরা ফাতাহ: ১৭]

সেই তিন ব্যক্তি!

যুবকশ্রেণীর এক যুবক এল এবং বলল, আমি একটি মেডিক্যাল কলেজে পড়ি, প্রথম বর্ষ শেষ হয়েছে। আমি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের..... যা কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সে বিদ্যালয়ের একটি অবস্থান আছে। সে তার জাতির মাঝে সম্মানিত, সে বলল, আমি প্রথম বর্ষ শেষ করেছি, বা দ্বিতীয় বর্ষ। আমার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? আমি জিহাদে অন্তর্ভুক্ত হব, নাকি ডাক্তারি লেখাপড়া শেষ করব? আমি তাকে বললাম, আমি কুরআন ঘেঁটে দেখেছি, সুন্নাহ বা হাদিসও দেখেছি, তবে তার কোথাও একথা পাই নি যে, ডাক্তারের জন্য জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকাতে কোনো সমস্যা নেই! এমনও পাই নি যে, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়াতে তাদের কোনো উজর আপত্তি থাকতে পারে যা উল্লেখ করার মত। অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়াতে কোনো কারণ দেখানো যেতে

পারে, যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া থেকে আপত্তি দেখাতে পারে এবং জিহাদে বের হবে না।

এই ইবাদত কি শুধু তাদের জন্য, যাদের কোনো ব্যস্ততা নেই!! এই ইবাদত কি তাদের জন্য, যারা সৌদিতে অবস্থান করতে পারে না!! যাদের কোনো কাজ নেই, যাদের কোনো অবস্থানের জায়গা নেই!! এই জিহাদ শুধু তাদের জন্য, যাদেরকে পুলিশ তাড়িয়ে বেড়ায়, যাদেরকে একটি ট্রাকে বা প্রিজন ভ্যানে আটকে রাখে......। তারা মনে করে, জিহাদ তো তাদের জন্য, যাদের দেশে কোনো অবস্থান নেই, যাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। যারা বেকারসমাজ, যারা অলস মস্তিস্কে ঘুমায়।

যারা কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান বা কারখানা প্রতিষ্ঠা করে, তারাই তো জিহাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। যে কিনা তার ব্যবসা, কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, চাকরি, তা দেশের যত উপরের স্তরেরই হোক না কেন, যদি সে একজন মন্ত্রীও হয় অথবা প্রধানমন্ত্রী হয়, সেই তো জিহাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। দেখুন আল্লাহ তায়ালা কী বলেন-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا.

'আপনি বলুন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মা-বাবা, ছেলেসন্তান, ভাইবোন, স্ত্রী-স্বজন এবং সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দাভাবের আশঙ্কা তোমরা কর, তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, এসব যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে, তবে অপেক্ষা কর.... [সুরা তাওবা: ৪২]

এবার বলুন, 'অপেক্ষা কর!' এর কী অর্থ?

আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম উপমা। যেমন আপনি কাউকে বললেন, একটু দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, আমি তোমার কী দশা ঘটাই? আপনি তাকে শাসাচ্ছেন, কোনোপ্রকার শাস্তির কথা না বলেই, এ হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয় প্রদর্শন। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখাব, সে তোমার কী দশা করে? এবং যে ব্যক্তি জিহাদ-লড়াই করছে না, তাকে অবশ্যই এমন শাস্তি ভোগ করতে হবে, যা তার মৃত্যুর পূর্বেই ঘটবে। আর যে মৃত্যুবরণ করেছে, তারও বেঁচে যাওয়ার কোনো উপায় নেই যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ জিহাদ করেনি, অথবা কোনো যুদ্ধাকে সাজিয়ে দেয়নি, কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজন দেখেনি, আল্লাহ তাকে অবশ্যই বড় কোনো বিপদে নিপতিত করবেন কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই।

فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

'তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।' [সুরা তাওবা- ২৪]

এমন ব্যক্তির জন্য তিনটি শাস্তি রয়েছে, বড় কোনো বিপদ, যা তার ওপর অতিসত্বরই আপতিত হবে, অপরটি হচ্ছে, তিনি তাকে হেদায়েত দান করবেন না। আর শেষটি হচ্ছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য যে, সে ফাসেক। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না।

আমার প্রিয় ভাই!

বিষয়টি কিন্তু নিতান্তই বিপদসঙ্কুল, গুরুতর, খুবই গুরুত্বপূর্ণ..... খুবই গুরুত্বপূর্ণ! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং মানুষের নিক্তিতে আমাদের কোনো মূল্যই নেই, যদি না আমরা জিহাদ করি। লড়াই ব্যতীত আমাদের অস্তিত্বের কোনো গুরুত্বই নেই।

বর্তমানে আরবরা কত চেষ্টা করছে যে, তারা রিগ্যানের সঙ্গে বৈঠক করবে, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে! অনেকবেশি, সে অগ্রাহ্য করে চলছে। অথচ সে আফগানদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আরবদেশসমূহের নেতৃবর্গ, তাদের কাছে পেট্রোল রয়েছে, তাদের কাছে সম্পদের ঢের রয়েছে, তারপরও সে তাদের সঙ্গে আলোচনায় অনাগ্রহী। অথচ সে নিজেই আফগানদের সঙ্গে বসতে চায়, কিন্তু তারা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। যেমনটা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ১৯৮৫ সালে ২৮ অক্টোবরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেন?

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ.

(সুতরাং, আপনি লড়াই করুন আল্লাহর রাস্তায়, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত কোনো বিষয়ে আপনি বাধ্য নন। আর মুমিনদেরকে আপনি উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন।) যদিও আপনি একাকীই হন না কেন। (অতিশীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের চক্রান্তকে প্রতিহত করবেন।) লড়াইয়ের মাধ্যমে, সমগ্র জাতিগোষ্ঠী আমাদেরকে ভয় করবে। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়কে উঠিয়ে নেবেন, তারা তোমাদেরকে ভয় করবে না। তোমাদের অন্তরে ওহান ঢেলে দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ওহান কী জিনিস? নবিজি বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা বা অনীহা, তাকে অপছন্দ করা। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ-এর একটি বর্ণনায় তা হচ্ছে, লড়াই জিহাদের প্রতি অনীহা দেখাবে, এমন বর্ণনাও আছে।

সুতরাং তোমরা কোথায় চলছ? এ তো এমন এক ইবাদত, যা কিনা নামায-রোযা, হজ, যাকাতের ন্যায় ফরজ। সুতরাং এ ফরজ দায়িত্বকেও আদায় করা উচিত বা অবশ্য কর্তব্য। নতুবা অপেক্ষা করতে থাক.., আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দেবেন না, আর তুমি একজন ফাসিক। আর তাই আল্লাহ তায়ালা এরপরের আয়াতে বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের সঙ্গে যেসব কাফেররা রয়েছে তাদের সঙ্গে লড়াই কর।'

অর্থাৎ তোমাদের পাশে যেসব কাফেরের দেশ রয়েছে, তাদের সঙ্গে লড়াই কর। এখানে 'লড়াই কর' আদেশসূচক বাক্য। যা কিনা ওয়াজিব বোঝায়, অত্যাবশ্যক করণীয় দায়িত্ব। বর্তমান সময়টা কেমন সময়? এ তো এমন দিন, যখন সারা বিশ্ব মুসলমানদের কর্তৃত্বে থাকবে। সুতরাং তা যদি কোনো লুণ্ঠনকারীর লুণ্ঠনের পাত্র হয়, ভোজে অংশগ্রহণকারীদের পরিবেশিত খাবারের পাত্র হয়, তোমাদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরকে ডাকতে থাকবে, যেমনটা খাবার ভর্তি পাত্রের প্রতি অন্যদেরকে আহবান করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি সেদিন সংখ্যায় কম থাকব?

নবিজি বললেন, না, তোমরা বরং সংখ্যায় অনেক হবে। তবে তোমরা সেদিন ভাসমান খড়কুটার ন্যায় হবে। আপনি কি পানিতে ভাসমান খড়কুটাকে দেখেছেন? জীবনে যার কোনো মূল্য নেই, হাজার মিলিয়ন খড়কুটা কোনো দেশে আক্রমণ করতে পারত, তবে তো তার চেহারাকেই পাল্টে দিতে পারত, হাজার মিলিয়ন টিকটিকি যদি কোনো এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ত, তবে তো তা খেয়েই ফেলতে পারে! বিষয়টি কি এমনই নয়? আল্লাহর কসম, যদি মুসলমানেরা এমন টিকটিকিই হত, তারা কাফেরদেরকে খেয়ে ফেলত, তাদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিত, তাদের অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে তুলত.....

কবি বলেন-

হায়, গালাগালি করা আর কুৎসা রটনা
যদি কোনো ঘাস-তরুলতা হত,
তবে তা আমরা মুসলমানদের ঘোড়া দিয়ে খাইয়ে ফেলতাম।
যারা কিনা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, হ্যাঁ!

আর হ্যাঁ, এ কারণেই ইবনুল কাইয়ুম তখন দামেশকের খতিব ছিলেন, তখন তাঁতারদের খবর এল যে, তারা অনেক মুসলিম অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। তারা দামেশকের দিকে এগিয়ে আসছে, তবে তাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে সাহস করছে না। মহিলারা যখন এ কথা শুনেছে, তখন তারা

তাদের মাথার চুল চেঁচে ফেলেছে এবং তা দিয়ে তারা ঘোড়ার লাগামের ন্যায় রশি বানিয়ে ইবনুল জাওযির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহিলারা তাদেরকে বলছে, যদি তোমরা পুরুষ না হয়ে থাক, তবে এ হচ্ছে তোমাদের ঘোড়ার লাগাম, হয়ত তোমরা তোমাদের মহিলাদের ওপর আক্রমণ করতে পারবে, হয়ত তোমরা আক্রমণ করতে পারবে!!

এমনকি আমাদের বয়স্ক মুরুব্বিগণ পর্যন্ত গতকালও বলেছি, আমাদের বন্ধু-প্রিয়জন, আলেমসমাজ মনে করছে, যারা জিহাদের জন্য আফগানে আসছে, এর অর্থ হচ্ছে- সে একজন নির্বোধ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, যে ভাবতে পারে না, যার অর্থ হচ্ছে- একজন বিগলিত হৃদয়ের ব্যক্তি। খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। তার জন্য তো উচিত ছিল যে, সে নিজের দেশেই বসে থাকবে। কারণ, যেমনটা আমাদের সম্মানিত শায়খ ও বন্ধু ফায়সাল বলেছেন, কারণ সে নিজেই নিজেকে আমেরিকা এবং রাশিয়ার যুদ্ধের মাঝে ঠেলে দিচ্ছে। এরপর আমরা কিভাবে আমাদের ছেলেসন্তানকে এমন এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারি, যা কিনা আমেরিকা অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে দীর্ঘ করছে! এরপর আমেরিকা যখন আর্থিক ও অস্ত্রের সহায়তা প্রদান বন্ধ করবে, তখন আমাদের দাঈ ভাইয়ের কী অবস্থা হবে?

আর আব্দুল্লাহ আযযাম খুবই ভুল করেছেন, যখন তিনি তার 'মুসলিম দেশের ভূমিরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তিনি এবং অন্যান্য শায়খগণ যারা তার মতই মত প্রকাশ করেন, তারা বুঝতে পারেন নি যে, ফরজে আইন পালন করার জন্য কোনো ইমামের নেতৃত্বের প্রয়োজন! হায় আফসোস! তারা আমাদের শায়খ, বন্ধু ফায়সালের জন্য এই ফাতওয়া কোথা থেকে আবিস্কার করেছে?! এমন ফাতওয়া কোথা থেকে আবিস্কার হয়েছে? তা কি কোনো কিতাবে পড়েছে যে, জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত? তারা এ কথা কোথায় পেল যে, আমেরিকা এই জিহাদকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে বিস্তৃত করে চলেছে? এ তো নিছক কল্পনামাত্র, এসব অলিক কল্পনা ঢুকিয়েছে আরবি এবং পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো। যেমনটা আমি আগেও বলেছি, আমি এখনো মনে করি, আমি অনেকের মধ্যে আফগান জিহাদ সম্পর্কে একটু বেশি জানি, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমেরিকা যদি একটি অস্ত্রের একটি টুকরোর দাম দিত এবং ক্ষেপনাস্ত্র, যাকে তারা আফগান

জিহাদের বীরত্ব হিসেবে অভিহিত করছে এবং যে ভরসা উম্মতে ইসলামিয়ার অন্তরে সৃষ্টি করেছে, তারা তাকে ক্ষেপানাস্ত্রের কর্মযজ্ঞ হিসেবে অবিহিত করতে চায়। আমেরিকান অস্ত্রই সব করছে এসব জঙ্গিবিমানগুলোর বিরুদ্ধে। আমেরিকা প্রতিটি ক্ষেপনাস্ত্রের মূল্য হিসেবে মুসলমানের সম্পদ থেকে ৭০ হাজার ডলার গ্রহণ করবে। ভাল, আমেরিকা আফগান জিহাদের অস্তিত্বের কারণে অনেকবেশি খুশি হয়েছে, কেন? সে বলে, বেশ হয়েছে, রাশিয়ান ভাল্লুক এবার আফগানের ফাঁদে পড়েছে, তার পা হিন্দুকুশ পাহাড়ে দেবে গেছে, আমরা এ জাতির চেয়ে কোনো উপযুক্ত জাতি পাই নি, যে কিনা রাশিয়াকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পারে।

তারা উসমান ﷺ-র জামা বহন করে চলছে প্রতিটি জাতীয় সম্মেলনে, যেন বিশ্ব দেখে, রাশিয়া আফগান জাতির সামনে টিকতে পারছে না। আর এ কারণে যারা নিরীহ নিরাপদ তাদেরকে জ্বালিয়ে, জাতিগত বিনাশ এবং গণহত্যা যা কিনা আফগানের নানা প্রান্তে ঘটে চলছে। কার্যত আমেরিকা জাতীয় সম্মেলনগুলোতে আফগানি পোষাকের ছদ্মছায়ায় রাশিয়াকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে। আর রাশিয়া আফগানের অভ্যন্তরে বসে হাওয়া খাচ্ছে। সুতরাং এভাবে পতনের পর পতন চলতে চলতে জাহান্নামে গিয়ে ঠেকবে ইনশা আল্লাহ। কিন্তু আমেরিকা আমাদের ভাবনা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, জিহাদ সে তো একটি আলোকজ্যোতি, যা মুসলিম উম্মাহের অন্তরে বয়ে চলে, তা অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়, মৃতকে জীবন দান করে। এই জিহাদ উম্মাহের মাঝে তাদের প্রতিপালকের প্রতি সেই আস্থা বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়, তাদের স্রষ্টা এবং রবের প্রতি তাওয়াক্কুলের গুণ দান করে। তাই, যখন ইসলামি বিশ্বের পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করল এই আফগান জিহাদের মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ করল যুবকসমাজের প্রত্যাবর্তনকে আফগানের ভূমিতে। হিসাব নিকাশ নতুন করে কষতে শুরু করেছে।

ইহুদিদের মনোযোগ ফিরল। তারা পাকিস্তানে ভ্রমণের দিকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। 'আপনারা আফগানে আসা কোনো যুবককে ভিসা দেবেন না। কারণ তারা ভয়ঙ্কর, তারা ফিরে আসছে নিজের দেশে। এসব ইহুদি-খৃস্টান আরব বিশ্বকে বলবে (তারা এ কথা বলবে না যে, আমরা জিহাদকে ভয় করি, যা কিনা নতুন প্রজন্মের অন্তরে জাগ্রত হতে শুরু করেছে, তারা

বলবে-) বিশ্ববাসীর সাবধান হওয়া উচিত, শাসক-রাষ্ট্রপ্রধানদের সাবধান হওয়া উচিত, এসব যুবকেরা আফগানে যাচ্ছে, সেখানে তারা ট্রেনিং গ্রহণ করবে এবং ফিরে এসে আপনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করবে...'।

আর এ কারণে তারা দু'দিক থেকে লাভবান হচ্ছে, এসব যুবকদের সম্পর্কে শাসকদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করছে।

এখানের ব্যাপারটি ঠিক তেমনই, যেমনটি নবিজি যেমনটি বলেছিলেন, হায় আফসোস, কুরায়শদেরকে যুদ্ধই খেয়ে দিয়েছে, তাদের কী হত, যদি তারা আমাকে এবং আরবদের বিষয়টি ছেড়ে দিত? যদি তারা সঠিক হয়ে থাকে, তবে তারা তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, যা তারা ইচ্ছা করেছে। আর যদি আপনি সঠিক হয়ে থাকেন তাদের ব্যাপারে, তবে তারা সম্পূর্ণই ইসলামে প্রবেশ করবে অথবা তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে শক্তি তাদের রয়েছে। আফসোস আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্য, তাদের কী ক্ষতি হত, যদি তারা যুবকদেরকে আফগানে আসার সুযোগ দিত, তবে তাদের অর্ধেকেই লড়াইয়ের ময়দানে শহিদ হয়ে যেত, এক চতুর্থাংশ আহত হত, যা হয়ত পঙ্গু আর এক চতুর্থাংশ তাদের দেশে ফিরে যেত, তারা তাদের জন্য একাউন্ট খুলত, সেসব রেজিস্টারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করত।

এ কত বড় মুসিবত? তোমরা আমাদেরকে আমাদের দেশে জিহাদ করতে বাঁধা দিচ্ছ, আমাদের সম্মান রক্ষা করতে বাঁধা দিচ্ছ, আমাদেরকে তোমরা বাঁধা দিচ্ছ..... ইহুদিরা ঘুমের ঘরে প্রবেশ করছে, অথচ তোমরা আমাদেরকে পায়ে শিকল দিয়ে রাখছ, আটকে রাখছ। যে ইসরাইলকে লক্ষ করে একটি গুলি ছুড়েছে, তোমরা তার পিঠে দশটি গুলি ছুড়ছ।

হ্যাঁ, তারা সত্যই বলেছে, যুবকেরা এখানে ছেলের ন্যায়, অথবা এখানে একটি দল ফিলিস্তিনের ভেতর লড়াইয়ে লিপ্ত ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরবদেশে যাদের কিছু অনুসারী বা বন্ধু রয়েছে, যারা ইসরাইলে একজন আটক হলে পরের দিন আরবদেশের একজনকে আটক করে। আরবদেশের সংবাদমাধ্যম এবং ইসরাইলের সংবাদমাধ্যম একে অপরকে সাহায্য করে চলছে...

এরপর কি?

প্রতিরক্ষামূলক লড়াই। মহামারীকে তারা ভয় পায়, কলেরাকে তারা ভয় পায়। আর কলেরা হচ্ছে জিহাদ। তিনশত শতাব্দী, তারা জ্ঞান এবং নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত, তারা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেছে, হাইস্কুল নির্মাণ করেছে, মহিলাদেরকে তাদের পোষাক থেকে বের করেছে, তারা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করিয়েছে, তার পোষাক খুলে নিয়েছে। সে এখন রাস্তায় যখন বের হয় তখন তার হাঁটুর ওপর পোষাক। কোনো মানুষ কি ভাবতে পারত, একজন মুসলিম নারী, মুসলিম মেয়ে রাস্তায় এই পোষাক পরিধান করে হাটতে পারে?!!

আল্লাহর কসম, আপনি যদি আপনার দাদির কাছে যান আর তাকে মিলিয়ন ডলার দিয়ে বললেন, আপনি এ পোষাক পরিধান করুন, একমুহূর্তের জন্যও তার পক্ষে কি এই পোষাক পরিধান করা সম্ভব? বাড়িতেও কি সে এ পোষাক পরিধান করতে পারবে? কোনোদিনই পারবে না। তারা নারীদেরকে তাদের লজ্জা থেকে বের করে দিয়েছে, তার দীন-ধর্ম, তার মূল্য, তার সূতিকাগার থেকে বের করে দিয়েছে, তারা সব ধ্বংস করে দিয়েছে...। যুবকশ্রেণিকে তারা যৌনতায় মজিয়ে দিয়েছে। যুবকযুবতীরা একে অপরের মাঝে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাটে, বিচারালয়ে সর্বত্রই নারীপুরুষের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দিয়েছে। এমনকি পুলিশের মধ্যেও নারী পাওয়া যায়, নিরাপত্তার জন্য নারী, নিরপত্তার জন্য? তারা বলে, এসব নারীরা চোর এবং হাশিশ ব্যবসায়ীদের থেকে এলাকাকে রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। যে মহিলা কিনা বাথরুমের মধ্যে একটি তেলাপোকা দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে, আর তারা বলছে, এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করবে চোর এবং মাদক ব্যবসায়ী থেকে, অপরাধীদেরকে দমন করবে। এ তো মজাদার গোস্ত, যা কিনা চোরে গিলে ফেলছে, এখানে তারা পোষাক পরিধান করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা বলছে, এ তো নিরাপ[illegible]ক্ষী!

একবার কাবুলের প্রধান সড়কে এক নারী পুলিশ বা ইবলিস দাঁড়িয়ে আছে, একটি গাড়িও সে ছাড়ছে না, সবগুলোকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি করছে। সে মুজাহিদদেরকেও অক্ষম করে দিয়েছে, তাদেরকে সে খুবই দুর্বল করে

ফেলে। তাদের একজনের নাম ছিল যারগুন, তিনি শায়খ সাইয়াফের একজন কমাণ্ডার ছিলেন। একটি গাড়ি ভাড়া নিলেন কাবুল থেকে এবং চালককে সুক্ষ্ম কিছু কথা বললেন, যা কিনা পুলিশও জানে না। তারা মাত্রই পনের মিটার অতিক্রম করেছেন, তারা সে পুলিশের কাছে চলে এলেন, সে তাকে ইশারা করল, একবার বা দুইবার। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সে তাকে খুব রাগতভাবেই থামতে বলেছে, সে থামতে অস্বীকার করে। পনের মিটার পরেই সে মহিলা পুলিশ তার কাছে চলে যায়, সে তখন খুব রাগান্বিত! মহিলা পুলিশটি গাড়ির দরজা খুলে ফেলে। যারগুন পেছনের চেয়ারে বসা, সে পেছনের চেয়ার থেকেই হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে পুলিশকে তার পাশে বসিয়ে ফেলে এবং চালককে বললেন, চল। তারা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌছে পুলিশকে একটি গর্তে ঢুকিয়ে জবেহ করে ফেলে। এভাবে তারা ধৃত হচ্ছে, যেমনটি আপেল পেড়ে আনা হয়।

তিনটি শতাব্দী চলে গেছে, তারা নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত, এমনকি আমরা একথা বলতে শুরু করেছি যে, ইসলামে কোনো লড়াই নেই। মুসলমানের মধ্য থেকে, মুসলিম দাঈদের মধ্যে হয়ত আপনি তর্কবিতর্ক করবেন, যখন সে আমেরিকা থেকে মগজধোলাই হয়ে ফিরে এসেছে, ধুয়ে-মুছে এসেছে, সেঁকে দেওয়া হয়েছে। সে ফিরে এসে আমাকে বলছে, আল্লাহর কসম, তুমি কি ইহুদি এবং খৃস্টানদের সঙ্গে লড়াই করতে চাও? ইহুদি এবং খৃস্টান?

আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। বণ্টনকারীকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি আপনাকে আমাদের কাছে বণ্টন করে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর কসম, সে ইসলামের দাঈদের একজন। আমি তাকে কিছু হাদিস বললাম। সে বলল, সব হাদিসেই ফজিলত এবং মর্যাদার কথা আলোচনা হয়েছে, হয়ত তা কোনো দেশ বা ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদা আলোচিত হয়েছে অথবা বুখারি এবং মুসলিমে যা আলোচিত হয়েছে, সেসব হাদিস একটু দেখে নিন, তা আপনাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। ধোয়া মগজ, তারা এমনসব ভাবনার জন্ম দিয়েছে, যা নতুন। তারা নতুন নতুন দীন-ধর্ম আবিষ্কার করেছে। কোনোটা কাদিয়ানি, কোনোটা বাহায়ি, কোনোটা বাবিয়া, সবার বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামে জিহাদ ও লড়াইয়ের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। নতুন নতুন দীন আর পরে আফগানের জিহাদের

আবির্ভাব হয়েছে, মিশর, শাম, ফিলিস্তিন, জর্দান এবং সৌদি থেকে যুবকেরা আসছে, তারা কেন আসছে? তারা আসছে আফগানে রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করার জন্য। কারণ, তারা ইসলামের শত্রু। তবে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে সঠিক বিষয়টি বেরিয়ে গেছে।

এখানে নিয়াকসন এসেছিল, তাকে রিগ্যান বলেছিল, দেখ, আফগানের জিহাদ কী বিষয়? বাস্তবতার চোখে দেখে যাও, জিহাদের শক্তি! সে পেশোয়ারের এসেছিল, তারা তাকে একটি তাবুতে নিয়ে গেল। সেখানে ছোট-বড় সবার কাছে শুনতে পাচ্ছিল, জিহাদই আমাদের একমাত্র পথ। তারা আরবিতে বলছিল। সে রাস্তায় চলতে চলতে বলল, আমি আফগানের সীমান্ত এলাকায় যেতে চাই। সে সারা পথেই উট, ঘোড়া ইত্যাদি দেখতে পেল। মুজাহিদগণের মাথায় পাগড়ি প্যাচানো। এই পাগড়িই তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাদের দাড়ি দুই কাঁধ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। তোমরা এর কি ব্যাখ্যা বলবে? এ তো মর্যাদা, এ তো শক্তি। প্রত্যেকেই বলছে, আল্লাহু আকবার! সে আফগানের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াল, সেখানে সে প্রকৃত লড়াই খুঁজে পেল। রুশ বাহিনী পরাজিত হচ্ছে। সে আমেরিকায় ফিরে গেল। তারা তাকে বলল, যেখানে গেলে সেখানে কী দেখতে পেলে? অমুক সমস্যার কী সমাধান দেখতে পেলে? সহজ বিষয়। আর অমুক বিষয়? সে বলল, তাও সহজ। তারা বলল, তবে সমস্যাটা কী? সে বলল, সমস্যা হচ্ছে, ইসলাম!!

এবার প্রকৃত বিষয় সামনে এসেছে। এখন এমন বিষয় সামনে এসেছে, যার ওপর ভিত্তি করে ঐক্যমতে পৌছা যেতে পারে। আমেরিকা এবং রাশিয়া মিলে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে ইসলামের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য। তারা বলল- এখানে কোনো ভুল থাকতে পারে। কার্টার তুমি যাও। সে পেশোয়ারে আসল। সে বলল, আমি সীমান্ত এলাকা দেখতে চাই। তাকে একটি হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হল লেন্দি কোতেল অঞ্চলে। যা কিনা আফগান এবং পাকিস্তান সীমান্তের একটি এলাকা, এটি একটি গোত্রীয় অঞ্চল। সীমান্তের খুবই নিকটে। সে বলল, আমি পায়ে হেঁটে আফগান সীমান্ত দেখতে চাই। আল্লাহু আকবার, কার্টার সে নিজে আফগানে যাচ্ছে, যে আফগান কিনা একটি মৃত্যুকূপ। মুসলমানের কোনো দল কি এসেছে? তারা কি পেশোয়ার ভ্রমণ করেছে? তাদের মধ্যে কতজন দাঈ রয়েছে?

কতজন আলেম রয়েছে? কতজন মুসলমান পেশোয়ারের ইয়াতিমদেরকে দেখতে এসেছে? শুধু পেশোয়ার, তাদের একজন আসছে ইসলামি স্টাডিজে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করার জন্য। সে দু-মাস অবস্থান করছে, অথচ সে লাহুরে, পরীক্ষা ঘনিয়ে আসা পর্যন্তই এখানে থাকছে। সে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছে। দশ রুপি তো তখন; যখন মন্দার দিন, তিন রুপি দিয়ে দুই মাস অবস্থান করছে। এরপর কসম থেকে অব্যাহতির দিন সে মনে করে, এখানে আফগানি জিহাদ চলছে। এ কথা যখন মনে করে, উল্টোপথে দৌড় দেয়! হ্যাঁ, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম? হ্যাঁ, আমি পনের দিন পর পেশোয়ারে এসেছি। আমার জন্য এখানে শায়খ সাইয়াফ, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, ইউনুস খালেস একত্রিত হয়েছে। আমি দেখতে চাই, তাদের সমস্যা কি? আমি একটি রাত পেশোয়ারে অবস্থান করতে চাই, ভুলে যাবেন না, তারা এমন পাখি, যাদেরকে আমি একটি খাঁচায় একত্রিত করতে পারি। যেন ব্যাপারটি এমন যে, সাইয়াফ, হেকমতিয়ার, ইউনুস খালিসের কোনো ব্যস্ততা নেই, তারা অবসর দিন কাটাচ্ছে, যাদেরকে আমি একই রাতে একত্রিত করতে পারি। যারা তাদের ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করবে, যারা লাহুরে এসেছে সে শুধুমাত্র একটি রাতই পেশোয়ারের জন্য ব্যয় করেছে। আমি তাকে বললাম- ভাই, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুটি রাত পেশোয়ারে থাকুন। প্রতি মাসে তার সাক্ষাতের সময় রয়েছে। সে আমাকে বলল- না না, আমি আগামীকালই প্লেনে লাহোরে চলে যাব, লাহোর থেকে করাচি, করাচি থেকে যেখানে আল্লাহ নিয়ে যায়।

এই লোকই কি ইসলাম এবং মুসলমানদের নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে? এই প্রচেষ্টার দ্বারাই কি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে? অথবা একটি শহর? আল্লাহর কসম, এর দ্বারা একটি ছোট্ট শহরও গড়া যাবে না, একটি শহরও না, কেন?

ভাই আমার, পাকিস্তানে যদি আপনার একজন ছেলে থাকত লেখাপড়া করতে, তবে আপনি তার জন্য আরও ভাবতেন, আরও ব্যস্ততা দেখাতেন, বেশি, অনেকগুণ বেশি। যে মহান কাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি ভাবছেন, যা আপনার চিন্তার বিষয়, কাফেরদের জন্য মুসলমানের পক্ষ থেকে সবচেয়ে জটিল ও কঠিন, তার জন্য যতটুকু সময় দেন, সন্তানের জন্য তার

চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ বেশি ভাবেন। যদি আপনার এই অপদার্থ ছেলে যে কিনা নামায পড়ে না, তার চেয়ে দশগুণ সময় ইসলামের জন্য ব্যয় করতেন, তবে সমস্ত হিসাব নিকাশই পাল্টে যেত।

আল্লাহর কসম, আপনি যদি একটি ব্যবসার দোকান খুলেন, সেখানে আপনি দশ হাজার দিরহাম পুঁজি বিনোয়োগ করেন, তবে কি আপনার জন্য এমনটা সম্ভব হবে যে, তার খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া পুরো একটি বছর তাকে এভাবে ফেলে রাখবেন। একটি দোকান দেখাশোনা করা, তার খোঁজখবর নেওয়া ব্যতীত কিভাবে চলতে পারে? তুমি আল্লাহর দীনকে একটি দোকানই মনে কর, হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! তার জন্য তুমি যেভাবে সময় ব্যয় কর, ইসলামের জন্যও কর। যদি তোমার ছেলেটি অসুস্থ হয় অথবা তোমার আদরের ছোট মেয়েটি, সে হার্টের রোগে আক্রান্ত; তবে তুমি কতবার তার সাক্ষাতে আসবে? যদি তা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে হয়, তার জন্য তুমি কতটাকা খরচ করবে? যদি তোমার সম্পদ থেকে থাকে।

একটু ভাবুন, এই ইসলামটিও তোমার ছোট মেয়েটি বা ছেলেটির মতই, সে এখন প্রায় জবেহের জায়গায় উপনীত, বিশ্ব থেকে মুছে যাওয়ার উপক্রম। তাকে তুমি ততটুকু সময় হলেও দাও, যতটুকু তুমি তোমার ছোট ছেলে এবং মেয়েকে দিয়ে থাক।

যদি মুসলমানেরা আফগান এবং আফগান জিহাদের জন্য একটু সময় দিত, যদি তারা খরচ করত, যতটুকু তারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য করে থাকে। সে হিসাব করে, কত টাকা দিয়ে তার জন্য এক জোড়া জুতা কেনা যেতে পারে, অথবা একটি পোষাক, ঈদের জামা, শীতের জামা, গরমকালের জামা। যদি এমনটা ভাবত, যতটাকা আমি এসব কাজে ব্যয় করব, ততটুকু টাকা আমি সিন্দুকে রেখে দেব, এরপর আফগান জিহাদে পাঠিয়ে দেব। তবে সবকিছুই পাল্টে যেত! মুসলমানেরা যতগুলো পেপসি আর মেরিন্ডা খায়, তার সাত ভাগের একভাগও যদি আফগান জিহাদের জন্য রাখত, তবে হিসাব ভিন্ন হত।

আমি আপনাকে একটি পরিসংখ্যান দিতে পারি, প্রতিদিন আরব দীপে প্রায় সাত মিলিয়ন বা তার চেয়ে বেশি পেপসি, মেরিন্ডা খাওয়া হয়! একবার ভাবুন, দিনে সবাই একটি করে মেরিন্ডা খায় শুধু। তার অর্থ হচ্ছে তারা দিনে সাত মিলিয়ন ডলার খরচ করে। এই বিরাট অংশটি যদি মেরিন্ডা খাওয়া থেকে বিরত থাকত এবং সাত মিলিয়ন দিরহাম আফগানে জিহাদে প্রেরণ করত, তার অর্থ হচ্ছে, মাসে আটাশ মিলিয়ন দিরহাম অর্থাৎ সাত মিলিয়ন ডলার, ১৪০ মিলিয়ন রুপি। এর দ্বারা আফগানের অভ্যন্তরীণ দৃশ্যই পাল্টে যেত। শুধু একটি সপ্তাহে, শুধু মেরিন্ডার কৌটা থেকে!

এবার বলুন, কীভাবে মুসলমানেরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাবে! এমনকি এসব অসহায় আফগান, যাদের দশটি বছর যাবত শূন্যবুকে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে আছে, যাদের পকেট শূন্য, পেটে খাবার নেই, পায়ে জুতো নেই, তারা পর্যন্ত তাদের কথা থেকে নিস্তার পায় নি। সে তার দেশে বসে চা পান করছে, আর বুলি আওড়াচ্ছে, আচ্ছা আফগান জিহাদ নিয়ে তোমার বক্তব্য কী? আল্লাহর কসম, তারা বলছে, তাদের কাছে শিরক রয়েছে, আর সেই শিরকগুলো কী, হে সম্ভ্রান্ত সন্তান? আপনি কি তা স্বপ্নে দেখেছেন? তারা বলে, আফগানিরা গলায় তাবিজ-কবজ ঝুলায়, কবর স্পর্শ করে, বরকতের নিয়তে! এছাড়া কি তোমার কাছে আরও কিছু আছে? তোমার দেশ কোনটি? সিরিয়া, সৌদি, নাকি মিশর কোনদেশে এসব নেই? মক্কাতে কি এমন সুফিদেরকে পাওয়া যাবে না? মদিনায় কি পাওয়া যাবে না? কোন জাতিগোষ্ঠী এসব থেকে মুক্ত? এরপর তুমি যা বলছ, সেসব শিরক কী বিষয়! তাবিজ যদি কুরআন-হাদিস এবং তাতে বর্ণিত কোনোকিছু দিয়ে হয়, তবে কে তাকে শিরক বা কুফর বলেছে, কে বিদআত বলেছে?

ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমগণ এ কথায় একমত পোষণ করেছেন যে, তিনটি শর্তে তাবিজ বৈধ হবে। কুরআন-হাদিস থেকে প্রমাণিত হতে হবে, বোধগম্য ভাষায় হতে হবে এবং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহই উপকার দেবেন। এসব কাগজ বা তাবিজ নয়। আপনি যদি আফগানে যান এবং এসব তাবিজ খুলে দেখেন, তবে দেখবেন, তার অর্ধেকেই হাদিসে বর্ণিত দুআয় ভরপুর। তাতে দেখা যাবে, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস। আপনি কিছু নাম্বারও পেতে পারেন। যেমন: ৭৮৬, যার অর্থ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এসব মানুষের আরবি হরফের যে মান রয়েছে, তা অনুপাতে ৭৮৬ লিখলে বিসমিল্লাহ-এর শব্দগুলো পাওয়া যায়। আর আপনার নিকট কি রয়েছে?

ভাল, হতে পারে এসব তাবিজে শিরকের অনেক কিছুই পাওয়া যাবে, এই ব্যক্তিটি এই তাবিজ হয়ত কোনো আলেম বা কবিরাজের কাছ থেকে নিয়েছে। সে মনে করে একজন আলেম এই তাবিজে কুরআন-হাদিসই ভরে দিয়েছে। তার তো এ কথা জানা নেই যে, এসব লোকেরা একে ব্যবসা হিসেবে ধরে নিয়েছে। সে তো এই তাবিজ এই ধারণাতেই নিয়েছে যে, এগুলো কুরআন এবং হাদিস। এরপর আমরা মেনে নিলাম, সেখানে শিরকি বিষয় রয়েছে, তারা জানে এখানে কি শিরক রয়েছে, তবে তারা কি মুশরিক? তারা কি শিরক করেছে? কারণ, তারা তো এই বিষয়ে অজ্ঞ। আর অধিকাংশই তো জাহলতের কারণে উযর-আপত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যদিও তা আকিদা বিষয়ে হয়।

ইবনে তাইমিয়া জাহমিয়া কাফেরদেরকে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাদের কথা অনুসারে কথা বলি, তবে আমি কাফের বলতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফের বলব না, কারণ তোমরা অজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব বলেছিলেন, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- নজদের যারা গম্বুজের পূজা করে, তাদের হুকুম কী? যারা গম্বুজের পূজা করে, তার চারপাশে তাওয়াফ করে, তারা কবরের ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, তারা কি মুশরিক? তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, আমরা তাদেরকে তাদের স্বল্পজ্ঞানের কারণে কাফের বলব না। তেমনিভাবে ইবনে কাইয়ুম রহ. বলেন, যারা কবরের ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, তাকে আমরা কাফের বলব না, কারণ তারা অজ্ঞ। এবার তবে তোমার জন্য আর কি বাকি থাকল ভাই আমার?

বলা হয়- তারা কবরে গিয়ে সাহায্য চায়, তুমি কি তা দেখেছ?

আমি শায়খ জালালুদ্দিন হাক্কানি রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার তাওহিদের ব্যাপারে কেন মনোযোগী হন না? তিনি আমাকে বললেন, হে শায়খ আবদুল্লাহ তাওহিদের ব্যাপারে সমস্যা কী? আমি তাকে বললাম, কবরের ব্যক্তি এবং ওলিগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা! তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমার বয়স এখন সাতচল্লিশ বছর, আল্লাহর কসম! আমি কোনো আফগানিকে এখন পর্যন্ত কোনো কবরওয়ালার কাছে সাহায্য চাইতে দেখিনি!!

তবে মনে হয়, আরবের লোকেরা দুর্বীণ দিয়ে তা দেখতে পেয়েছে, অথবা আধ্যাত্মিক কোনো শক্তিবলে আরবে বসেই অনুধাবন করতে পারে! আফগানের সন্তান কোনোদিন এমনকিছু দেখেনি, তবে কি আরবের লোকেরা মনে হয় সামনে পিছনে সর্বত্রেই দেখে।

তবে আরও কিছু হয় তুমি বলতে পার, ভাই আমার! তাদের মধ্যে বিদআত রয়েছে। বিদআত কী জিনিস? তাদের কাছে এমন কী বিদআত রয়েছে? আমি বিষয়টি বুঝতে চাই। আমাকে বলুন, পরিস্কার করুন। আপনি আরবে বসে চা পান করছেন, খেজুর চিবুচ্ছেন, আর আমাকে বলছেন...। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ঊনচত্বারিংশ মজলিস

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞

'হে ঈমানদারগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন।

যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, 'এর দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল?' যারা মুমিন এ আয়াত একমাত্র তাদের ঈমানই বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে [কুফর, শিরক, নিফাক এবং বিদআতের] ব্যাধি রয়েছে, এসব আয়াত তাদের কলূষের সঙ্গে আরও কলূষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

তারা কি দেখে না, তাদেরকে প্রতি বছর একবার বা দুই বার বিপর্যস্ত করা হয়?' তারপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদেরকে কেউ লক্ষ করছে কি?' অতঃপর তারা সরে পড়ে, কেটে পড়ে! আল্লাহ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই।

নিশ্চয় তোমাদের থেকেই তোমাদের নিকট রাসুল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপর তারা যদি বিমুখ হয়, তবে আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।' [সুরা তাওবা- ১২৩- ১২৯]

এ আয়াতগুলো হচ্ছে সুরা তাওবার শেষ আয়াত।

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً.

'কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়।'

এখানে غلظة শব্দটির বিশ্লেষণ লক্ষ করুন, এ শব্দটির মধ্যে الغين، الظاء উচ্চতার গুণের দুটি হরফ রয়েছে। আর জিহাদের ভিত্তিই হচ্ছে, সুউচ্চকরণ। কাফেরের সম্মুখে ঈমানের উচ্চতা, আর মুমিনের সামনে নতিস্বীকার। আর তাই আমার মনোযোগ চলে গিয়েছে কুরআনের এই আয়াতটির দিকে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

'হে মুমিনগণ, তোমাদের কেউ দীন থেকে বিমুখ হলে, তাদের পরিবর্তে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাকে ভালবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি কোমল আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না, এ তো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' [সুরা মাঈদা: ৫৪]

এ হচ্ছে এমন চারটি গুণ, যাদের অধিকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন। মুমিনদের জন্য বিনয়ী, কাফেরদের জন্য কঠোর; সাক্ষাত যমদূত। তারা জিহাদ করেন, কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় তারা করেন না। আমি বললাম, দেখ, নাজমুল হাকিম সে মুমিনদের জন্য বিনয়ী এবং কাফেরদের জন্য কঠোর হয়ে এসেছে! তারপরের গুণ হচ্ছে, তারা জিহাদ করে, কেন? কারণ জিহাদ সঙ্ঘবদ্ধ কাজ, আমল, ইবাদত। যেসব মানুষেরা তাবুর মধ্যে বসবাস করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, পার্শ্ববর্তী গোত্রের সঙ্গে, তবে যতক্ষণ তাদের মাঝে বিনয়, ভালবাসা, হৃদ্যতা এবং বন্ধুত্ব হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে জিহাদ হবে না। তাই আপনাকে প্রথমে আপনার অনেক ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণ থেকে নেমে আসতে হবে। আপনাকে বন্ধন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমমনা হতে হবে, আপনার আশপাশের মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলতে হবে।

তবে সবাই যদি এমন হয় যে, সবসময় রাগে তার ঘাড়ের রগ ফুলে থাকে, নাক ফোলায়, একটি মাছিও তার নাকের ডগার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না, তবে এই দলের সঙ্গে একত্রে বাস সম্ভব নয়। কোনোভাবেই নয়। অবশ্যই মুমিনের সামনে বিনয়ী হতে হবে। আমিরের আনুগত্য করতে হবে। আমিরের আনুগত্য অনেকক্ষেত্রেই তোমার প্রবৃত্তির বিরোধী হবে। আনুগত্য লাঞ্চনা, তবে ইবাদত। মুমিনের সামনে বিনয়ী। আমিরের আনুগত্য আল্লাহর নিকট নফল নামাযের চেয়েও মর্যাদাকর। আর আমিরের অবাধ্য হওয়া আল্লাহর নিকট সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং নফল নামায ছেড়ে দেওয়ার চেয়েও মারাত্মক। অর্থাৎ আমির যদি আপনাকে বলে, বাতি নিভে যাওয়ার পর কথা বলা নিষেধ, তারপর আপনি কথা বললেন, তবে আপনি যদি ঈশার সুন্নাত ছেড়ে দিতেন, তবে তার গুনাহ এর চেয়ে কম হত! কেন? কারণ ভাল বিষয়ে, কুরআন সুন্নাহের অনুগামী বিষয়ে আমিরের আনুগত্য করা ফরজ, তার অবাধ্য হওয়া হারাম। আর সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া, সে তো এমন যে, যে তা পালন করবে, তাকে সাওয়াব দেওয়া হবে, আর যে তা ছেড়ে দেবে, তাকে কোনোপ্রকার শাস্তি দেওয়া হবে না![১] সুন্নাত ভাল একটি

---

[১]. তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ১২ রাকাত সুন্নাত রয়েছে, যার গুরুত্ব অপরিসীম, তা অবশ্যই আদায় করা, অলসতাবশতঃ ছেড়ে না দেওয়া!

বিষয়, বৈধ একটি বিষয়, প্রশংসনীয় বিষয়। প্রশংসনীয় বিষয় আদায়কারীকে সাওয়াব দেওয়া হয়, তা ত্যাগকারীকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

আর এ কারণে নবিজি বলেছেন-

'যে আমার আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার আমিরের অবাধ্য হল, সে আমার আবাধ্য হল, আর যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহর অবাধ্য হল।'

'যে আমার আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল।' কারণ, আপনার সঙ্গে যেসব সঙ্গীরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে আপনি একমত হওয়া ব্যতীত সামনে এগুতে পারবেন না। আপনার তাবুর আমিরের আনুগত্য ব্যতীত, আপনার ক্যাম্পের আমিরের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়। হতে পারে আপনি তার চেয়ে উঁচু স্তরের, তার চেয়ে মেধাবী, তার চেয়ে জ্ঞানী, তার চেয়ে বাহাদুর। অস্ত্রের ব্যবহারে পারদর্শী, তবে সে আপনার আমির। সে যতক্ষণ আপনার আমির থাকবে, তার আনুগত্য করা আপনার জন্য আবশ্যক। তার অবাধ্য হওয়া গুনাহ। আর তার জন্য বিনয় প্রয়োজন। আপনি যদি আপনার ঘরে থাকেন, তবে আপনার ওপর কেউ কর্তৃত্ব করতে আসবে না। আর এখানে আপনাকে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর বা নেতার আনুগত্য কর।' [সুরা নিসা: ৯৫]

এ আয়াতে উলুল আমর বা নেতৃবৃন্দ বলতে অনেক মুফাসসিরিনে কেরাম সৈন্যবাহিনীর নেতাদের কথা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর এ কারণে আপনি দেখবেন, একটি বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্যবাহিনী আছে; কিন্তু তাদের কেউ আমিরের কথা অমান্য করে চলে না। কারণ, তারা জানে, আমিরের

কথার অবাধ্য হওয়া আল্লাহ তায়ালার আদেশের অমান্যতা। আর আল্লাহর আদেশের অমান্যতা হারাম। হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, আর যে হারাম ত্যাগ করবে, তাকে তার জন্য প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং আপনার চারপাশের মুমিনদের জন্য আপনি বিনয়ী হতে চেষ্টা করুন। আর যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলবে, যা আপনাকে আশ্চর্যন্বিত করে, তার অস্থিরতা, তার নিন্দা-ভর্ৎসনা, তার বিদ্রূপ অথবা তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করল, একজন মানুষের মন্দ হওয়াা জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে বিদ্রূপ করে।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে-

'সুদের সত্তরেরও বেশি স্তর রয়েছে, তার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে- সুদখোর তার মায়ের সঙ্গে যিনা করা। আর সুদের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে মুখ খুলবে।'

অর্থাৎ তার গিবত করবে। তার পরনিন্দায় লিপ্ত হওয়া! ইজ্জত-সম্মান তো হচ্ছে, যার নিন্দা করা হয় বা তার কিছু আবিষ্কার করা হয়, যার দ্বারা তার বদনাম হয়। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম কারো গিবত শেকায়েত হতে দেখলে, তার হয়ে প্রতিবাদ করতেন।

যখন নবিজি কা'ব ইবনে মালেক সম্পর্কে তাবুকের যুদ্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন বনি কা'বের এক ব্যক্তি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাকে তার সম্পদের প্রতি ঝোঁক এবং তার চাদরই তাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে অথবা এমনই কিছু বলল। সাআদ ইবনে মাআয বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তাঁর সম্পর্কে ভালই জানি!

আপনারা যখন এখানে আছেন, তখন ভাবতে হবে, আপনার মা নেই, বাবা নেই, আপনার ভাই নেই। আপনার ভাই এখানে তাকে মনে করুন, যে আপনার কাছে আছে। যে বয়সে বড় তাকে নিজের বাবার মত মনে করুন। যে বয়সে ছোট, সেই আপনার ছোট ভাই। আর আপনার মা হচ্ছে আফগানের জিহাদ, অথবা আফগানের লড়াই। এভাবেই আপনাকে ভাবতে

হবে, নিজের সম্পর্ক, বন্ধন পাল্টাতে হবে। ব্যস, আমাদের সম্পর্ক আর বন্ধন সমাজ ও পরিবার থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যে সমাজ আর পরিবারে আমরা আগে ছিলাম। এখন আমরা একটি নতুন সমাজে আছি, যেখান আমাদের পিতৃগণ আছেন, বড় ভাই আছে, আছে ছোট ভাই ও বন্ধু। আমাদের ভূমি আছে, নতুন ভূমি, নতুন দেশ, নতুন শহর। তবে সবকিছুই পাল্টে গেছে। এভাবে আপনি নিজের জীবনকে জুড়ে নিতে পারেন, দীর্ঘ পথের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে পারেন।

আবু যার, যে কিনা কয়েকটি বছর পূর্বেও বেলালকে ক্রয় করতে পারতেন, যেমনটি তিনি হাছানকে ক্রয় করেছিলেন বাজার থেকে। যখন বেলাল কোনো ভুলভ্রান্তি করতেন, তাকে বলতেন, এই কালোর ছেলে! নবি করিম ﷺ বলেন, তোমরা কি জাহেলি সমাজের সম্বোধনে ডাকছ, অথচ আমি তোমাদের মাঝেই বিদ্যমান, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। সাদার কোনো মর্যাদা নেই কালোর ওপর একমাত্র তাকওয়া ব্যতীত।

তাকে নবিজি আরও বললেন-

'হে আবু যার, তোমার মধ্যে তো এখনও জাহিলি সমাজের অভ্যাস রয়ে গেছে!'

আবু যার একথা শুনে তিনি তার চেহারাকে মাটির ওপর রাখলেন এবং কসম করে বললেন, বেলাল যেন তার চেহারা মাটিতে ঘসে দেয়! বেলাল কি সত্যিই তার কপাল মাটিতে ঘষে দেবেন? কয়েক বছর পূর্বে বেলাল رضي الله عنه আবেদন করেছিলেন, যেন তাদের জন্য নবিজি আলাদা একটি মজলিস করেন, যেখানে তারা নবিজির সঙ্গে মিলিত হবেন, যেন আরবের মানুষ তাদেরকে কোনো প্রকার অপবাদ দিতে না পারে যে, তারা বেলাল বা তার মত লোকদের সঙ্গে বসেছে।

হে মুহাম্মদ! আমাদের জন্য একটি আলাদা মজলিস করুন। কেননা, আমাদের ভয় হয়, আরবের মানুষেরা আমাদেরকে এসব গোলামদের মাঝে

বসা দেখে অপবাদ দেবে যে, আমরা এদের সঙ্গে একত্রে বসে আছি। নবিজি তাদের জন্য একটি পৃথক বৈঠক করার কথা প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন। যেখানে কুরাইশের উচ্চস্তরের লোক, আরবের নেতা শ্রেণী বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবে। জিবরাঈল ﷺ অবতরণ করলেন, বলা হল-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

'যারা তাঁদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ডাকে, তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন না। তাদের কাজকর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব আপনার নয় আর আপনার কোনো কাজের জবাবদিহিতার দায়িত্বও তাদের নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করে দেবেন। আর যদি আপনি এমন করেন, তবে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [সুরা আনআম: ৫২]

তবে কাফেরের ওপর অবশ্য প্রাধান বিস্তার এবং কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। মুমিনদের সামনে বিনয়। তাদের সঙ্গে দয়া ও বন্ধুত্ব। নিজেদের মধ্যে সুহৃদ, কাফেরের জন্য কঠোর...।

কুরআনে বলা হচ্ছে-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

'মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীরা কাফেরদের জন্য কঠোর আর নিজেদের মধ্যে সুহৃদ, বন্ধুত্বপূর্ণ।' [সুরা ফাতাহ: ২৯]

তারা সুহৃদ, বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের একেকজনকে তুমি তার ভাইয়ের জন্য বন্ধু, সুহৃদ, বিনয়ী; তবে যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের সামনে সিংহ-শার্দুল, যমদূতের ন্যায় দেখতে পাবে!

যুদ্ধের ময়দানে আবু দুজানা যখন তার মাথায় লাল ফিতাটি বাঁধলেন, নেমে এলেন এবং একজন ব্যক্তিকে হুঙ্কার দিতে শুরু করলেন নবিজি তাকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা এ অহঙ্কারকে অপছন্দ করেন, তবে এমন জায়গায় [যেখানে শত্রুকে পরাজিত করা, ইসলামের নাম উচ্চকিত হয়, তখন এ বাহাদুরি] পছন্দ করেন। কাফেরের সামনে বীরত্ব প্রদর্শন পছন্দ করেন; কিন্তু আমরা পাল্টে গেছি মুসলমানের ক্ষেত্রে! আমরা তাকে আমেরিকার সামনে এমন অবস্থায় দেখি, যেমনটা ইঁদুর বিড়ালের সামনে স্যার, জি স্যার করে। তার পিঠটি তাদের সামনে ঝুঁকতে ঝুঁকতে বাঁকা হয়ে গিয়েছে; অথচ সে মুমিনের সামনে উদ্ধ্যত অহঙ্কারী, অত্যাচারী।

আল্লাহর কসম! আপনি যদি তাদেরকে পান, তাদেরকে দেখেন, এসব তাগুত [মুনাফিকদের] দেখেন, যারা মুসলমানদেরকে অসংখ্য দুর্দশার সম্মুখীন করেছে। তারা রিগ্যান, আমেরিকা এবং রাশিয়ার সামনে কীভাবে নতজানু হয়ে বসে, নিজেদের জীবনের ওপর যারা ভীতসন্ত্রস্ত, তাদের স্বজাতির ওপর অত্যাচারী, তাগুতি শক্তি, তার কাছে রক্ত প্রবাহ করা পানি পান করার চেয়েও সহজ। তারা আমেরিকার সামনে চোখের জল ফেলে। হ্যাঁ এটিই সত্য। আমাকে একজন বলেছেন, ইংরেজরা আমাদের শাসন করত, তাদের বংশধর, এসব মুনাফিক, যারা কিনা তাদের পোষ্যপুত্র, তারা এখনও আমাদের দেশ শাসন করছে। ইংরেজ রাষ্ট্রদূত দেশের বিচারক অপসারণ করছে, আরেকজনকে নিয়োগ দিচ্ছে।

যারা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাদের একজন আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে বলা হল, এ পত্রটি বিচারকের কাছে নিয়ে যাও, তাকে বল- তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আর তার কাছেরই আরেকজনকে তার জায়গায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বলল- আল্লাহর কসম! আমরা আরবরা মানুষকে লজ্জা করি, যাদের মাঝে আমাদের ওঠাবসা আছে, তাদের সঙ্গে এমন করতে। সে ইংরেজ রাষ্ট্রদূতকে বলল, যদি আপনি একটি কথায় তাকে অপারগতা জানাতেন। অর্থাৎ একটু সমবেদনা জানানো যে, আপনারা তাকে বরখাস্ত করেছেন। একটি কথা অর্থাৎ আমাদের কিছু মনে করবেন না।' সে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত বলল- আমি কি এই কুকুরের কাছে অপারগতা প্রকাশ করব, এভাবে? আমি তার কাছে অপারগতা জানাব?

তারা এভাবেই দেখে। এই কুকুরকে আপনি কুকুরই দেখতে পাবেন, প্রতিটি মুসলমানের ওপর। তার সামনে দিয়ে যেই গমন করে, সে তাকেই কামড়ে দেয়, তাকে আহত করে, তার গোশত দেহ থেকে খুবলে নেয়!

কঠোরতা আর কাঠিন্য তো কাফেরের ওপর হবে।

আর তাই, তারা ইবনে হাজার হাইসামি রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করেছিল- কোনো মুসলমান কি কোনো কাফেরের সঙ্গে মুসাফাহা করার জন্য বা চুমো দেওয়ার জন্য হাত বাড়াতে পারে? তিনি বললেন, না। এতে তার মন প্রশান্ত ও খুশি হয়ে যাবে। কারণ, খৃস্টানের অন্তর প্রশান্ত হবে, যখন সে আপনার হাত চুম্বন করবে। তিনি বললেন, তোমার হাত বাড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে তা চুম্বন করবে!

আর এ কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ যখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন, তখন কয়েকটি শর্তারোপ করেছিলেন খৃস্টানদের জন্য।

তারা ঘণ্টা বাজাতে পারবে না।
ঘণ্টা দিতে পারবে না।
কোনো গির্জা বানাতে পারবে না।
তাদের আনন্দ উৎসবে বের হতে পারবে না।
তাদের সন্তানদেরকে পবিত্র পানিতে গোসল দিতে পারবে না।
ঘোড়ার ওপর জিন লাগিয়ে আরোহন করতে পারবে না।
যদি জিন লাগায়, তবে আরোহনের সময় দু-পা একদিকে রাখবে।
তাদেরকে তিনি শর্ত দিলেন যে-
তাদেরকে পৃথক একটি আকৃতি গ্রহণ করতে হবে।

তারা যে কাপড় পরত, তাতে ভিন্নধরনের একটি টুকরো লাগাত। যেমন কালো কাপড় পরিধান করলে, তাতে এক টুকরো সাদা কাপড় লাগাত তারফুকের ন্যায়, যেন কেউ দেখলে চিনতে পারে, এ খৃস্টান। সুতরাং তার সালামের জাওয়াব দেওয়া হত না। যখন কোনো খৃস্টান আরোহন করে

যেত, আর কোনো মুসলমান হেঁটে চলছে, তবে তাকে নেমে যেতে হত। সে তার বাহন থেকে নেমে যেত, যেন কোনো মুসলমান তার নিচে না থাকে।

কোনো খৃস্টান তার ঘর কোনো মুসলিমের ঘরের চেয়ে উঁচু করতে পারবে না।

যখন কোনো মুসলিমের সঙ্গে রাস্তায় সাক্ষাত হবে, তখন তাকে রাস্তার কিনারা ধরে হাঁটতে হবে, যেন রাস্তার মধ্যভাগ মুসলমানের জন্য থাকে। একেই তো বলে সম্মান, তা-ই নয় কি?

তবে বর্তমানে দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, কঠোরতা মুমিনের জন্য হয়ে গিয়েছে, দয়া আর অনুগ্রহ এখনে কাফেরের জন্য।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً.

'তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখে।' [সুরা তাওবা- ১২৩]

স্বাভাবিকই আপনাকে অনেকেই বলবে, আরে ভাই, ইসলাম তো দয়ামায়ার ধর্ম। ইসলাম তো পুরোটাই শিষ্টাচার এবং দয়া, ভালবাসা। এসব কঠোরতা আর কাঠিন্য আবার কী?

যা হোক, কঠোরতা প্রকাশ করা দরকার। আর হালকা মুচকি হাসি আমেরিকার সামনে আর মুমিনের সামনে গোমরা মুখ, তা হবে না। মুচকি হাসি হবে মুমিনের সামনে। সবসময় মুমিনকে পাশে রাখতে হবে, ফাসেক, ফাজের, কাফেরকে সবসময় দূরে ঠেলে রাখতে হবে।

আমাকে একজন বলেছেন এ ঘটনাটি, যা আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি। জর্ডানের হরকাতে ইসলামির নেতা মুহাম্মদ আবদুর রহমান বলেছেন, আমি মুসলমানকে সম্মান করতে বা তাঁর কতটুকু মর্যাদা তা দিতে শিখেছি একটি কাহিনী থেকে। আমি তখন ছোট। সালতের বিচারপতির অসুখ। এটি জর্ডানের একটি দেশের নাম। আমি তখন ছয় বছরের ছেলে। আমি চিন্তা করলাম, তার সঙ্গে সাক্ষাত করব। তার শুশ্রূষা করতে যাব। ঠিক এমনই

ভেবেছিলাম। আমি তখন ছয় বছরের বালক। আমি গেলাম এবং কলিংবেল বাজালাম। বিচারপতি বেরিয়ে এলেন। আমি তাকে বললাম, আমি আবদুর রহমান খলিফা। আমাকে আমার পিতা আপনার সাক্ষাত করতে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, এসো বাবা! তিনি বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তার সেখানে খৃস্টানদের বড় বড় নেতারাও এসেছে, তার অসুখের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। কেউ হয়ত পাদ্রী, কেউ অর্থডক্স, লাতিনের মন্দিরের ধর্মগুরু। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, দুটিই সালতে অবস্থিত। আমি যখন প্রবেশ করলাম, আমি একজন ছোট শিশু, তিনি একজন খাওরিকে বললেন, তুমি এখান থেকে উঠ, ওখানে বস। আর বাবা এসো, তুমি আমার পাশটিতে বস।

এরপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দীন আমাকে এমনই নির্দেশ করে যে, আমি তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করব। আবার আমি যখন তোমাদের সাক্ষাতে যাব, তখন তোমরা আমার সঙ্গে তেমন আচরণ কর, যেমনটি তোমাদের দীন বলে।'

তিনি বলেন, তখন থেকে আমি বুঝতে পারলাম, মুসলিম হচ্ছে সম্মানিত, মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানি ব্যক্তি।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

'তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা দেখতে পায়। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গেই আছেন।' [সুরা তাওবা- ১২৩]

কারণ, জিহাদ তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়ানো। তাকওয়া ব্যতীত অস্ত্র বহন হবে মুসিবতের অন্যতম একটি মুসিবত।

তাকওয়া ব্যতীত অস্ত্রধারণ হবে মানুষের ওপর ডাকাতি করার নামান্তর। তাদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর ন্যায়। তাদের সম্মান এবং সম্পদের জন্য ভীতিকর ও বিপদজনক। সুতরাং তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

একজন ব্যক্তি যখন তার হাতে কোনো অস্ত্র আসবে, তখন তাকে এই অস্ত্রের ব্যবহারবিধি জানতে হবে, আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভয়। ভয়, মুসলমানের রক্ত প্রবাহ থেকে। ভয়, অস্ত্রের জোরে মুসলমানের টাকা-পয়সা হস্তগত করা থেকে। এই ভয় ব্যতীত অস্ত্র এমনই এক বিপদ যে, একজন মানুষ অস্ত্র বহন করছে, এক্ষেত্রে তাকওয়া আবশ্যক, বাধ্যতামূলক। তাকওয়ার নিশানার বাধ্যবাধকতা জিহাদের জন্য বাধ্যবাধকতা। কুরআনে দুটি সুরার অধিকাংশ আয়াতই এই তাকওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে, সুরা তাওবা এবং সুরা মাঈদা। কারণ, এ দুটি সুরা কুরআনে অবতীর্ণ হওয়া শেষ সুরা। তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানবজাতির শুরু এবং শেষ সবার জন্য অসিয়ত।

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.

'আর আমি অসিয়ত করছি তোমাদেরকে এবং তামাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদেরকে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।' [সুরা নিসা: ১৩১]

সুতরাং এ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অসিয়ত মানবজাতির শুরু-শেষ সবার জন্য। তাকওয়া ব্যতীত দীনের কোথাও কোনো উপকার নেই। তখন দীনের অর্থ হয়ে যাবে এক রুসম-রেওয়াজমাত্র। যার অর্থ হবে, এসব রুসুমের অধিনে কিছু বক্তব্য দেওয়ামাত্র। চুরি, ছিনতাই, যিনা-ব্যভিচার, সম্মানহানী ইত্যাদি।

তাই, তাকওয়া অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ তাকওয়া প্রকৃত ও সত্যিকারের খোদাভীতি। এই অভ্যন্তরীণ খোদাভীতি আপনাকে আল্লাহর পর্যবেক্ষণে রাখবে, মানুষের চোখের পর্যবেক্ষণের চেয়েও বেশি। মানুষ আপনাকে দেখুক আর না-ই দেখুক, সবই সমান মনে হবে। আজ এই খোদাভীতি শেষ হয়ে শূনের কোঠায় নেমে এসেছে। এই তাকওয়া কমে গেছে। আর তাই আপনি দেখবেন, [লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ] অনেক মানুষ আছে, যাদের দীন হচ্ছে সেই কাগজের ন্যায়, যেখানে মিষ্টি হালওয়া মোড়ানো থাকে। যাকে কেউ মনে করছে টিনের কৌটা, তাড়াতাড়ি

ফেটে যাবে, কেন? কারণ, এখানে এমনকিছু নেই, যা তার দীনকে সংরক্ষণ করতে পারে।

পুরো মানবজাতি এবং সম্পূর্ণ দীনই টিকে আছে এই তাকওয়ার ওপরে। এই দীন নষ্ট হবে একমাত্র তাকওয়ার ঘাটতির কারণে, খোদাভীতির ঘাটতি এবং অতিমাত্রায় লোভলালসার কারণে।

একবার আলি ﵁ কুফায় এলেন। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ তখন টগবগে যুবক। তাকে আলি ﵁ বললেন- দীন কীসে নষ্ট হয় এবং কীসের দ্বারা তা ঠিক থাকে বা সংশোধন হয়? তিনি বললেন, দীন ঠিক রাখবে খোদাভীতি আর নষ্ট করবে লোভলালসা। বাস্তবও এমনই...।

কবি বলেন-

وهل أفسد الدين إلا الملوك * وأحبار سوء ورهبانها

لقد رتع القوم في جيفة * يبين لذي اللب إنتانها

رأيتُ الذنُوبَ تميتُ القلوبَ * ويورثُكَ الذل إدمانُها

وترك الذنوب حياةُ القُلُوب * وخَير لنفسكَ عصيَانُها.

দীন-ধর্মকে রাজাবাদশা, আলেম আবেদ ছাড়া
আর কে নষ্ট করেছে?
সবাই তো লাশ নিয়ে মজে আছে,
তবে জ্ঞানীজনের কাছেই কেবল তার
দুর্গন্ধ ছড়ানো এবং পঁচে যাওয়ার জ্ঞান রয়েছে
গুনাহের চেহারা আমি দেখেছি,
তার ধর্মই হচ্ছে, অন্তরকে মৃত্যুর ঘাঁটে পৌঁছে দেওয়া
আর তাতে লিপ্ত ব্যক্তির ভাগ্যে জুটবে অপমানের কালিমা।
পঙ্কিলতা ত্যাগেই তো হৃদয়ের জীবনলাভ হয়
আর গুনাহের অবাধ্য হওয়াই তো নিজের সত্তার অস্তিত্ব কল্যাণ!

কিয়ামতের দিন এমনকিছু লোকও আসবে যাদেরকে দেখতে তিহামাহ অঞ্চলের সুন্দর পাহাড়ের ন্যায় মনে হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদেরকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আমাদেরকে তাদের কিছু গুণাবলী বর্ণনা করুন। নবিজি বললেন, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা রাত্রি জাগরণ করতঃ তাহাজ্জুদ আদায় করবে। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত বস্তুর সঙ্গে নির্জনে যায়, তখন তা ভঙ্গ করে, নির্জনে অশ্লীলতার সুযোগ পেলে বলৎকার করে, তাতে জড়িয়ে পড়ে।

যদি এই তাকওয়াই অর্জন না হল, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কী অর্থ থাকল? আল্লাহর আসমায়ে হুসনার একত্ববাদের কী অর্থ? তার মানে কি শুধু এই যে, তুমি তা মুখস্ত করে নিবে যে, আমরা তার আসমায়ে হুসনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি, যা কুরআন এবং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোনো তাবিল, ব্যাখ্যা, বিকৃতি করি না, তাকে বেকার ছুড়ে দেই না এবং তার জন্য কোনো উপমাও দেই না। ব্যস্ আমরা আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করে ফেললাম, নাকি? আমি কি সেই প্রত্যক্ষকারীর সঙ্গে তেমন আমল করি, যিনি আমি যা কিছু করি সব দেখেন? এই বিশ্বাস কি করি? আমি কি সর্বজ্ঞ মহানসত্তাকে ভয় করি? তাকে কি ভয় করি, যিনি সর্বশ্রোতা? তাকে কি ভয় করি, যিনি সবকিছু দেখেন। যদিও আমি আমার জন্য সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করেও নিই? তুমি কি তাকে ভয় কর, যিনি স্পষ্ট-অস্পষ্ট সবকিছুই দেখেন, জানেন। যখন তুমি কোনো প্রতিবেশী মেয়ের দিকে তাকাও, তিনি তোমাকে দেখছেন? তুমি কি সেই মহাপ্রবল, পরাক্রমশালীকে ভয় কর, যখন তুমি কোনো মুসলমানের সম্পদের প্রতি হাত বাড়াও? খোদাভীতি ব্যতীত সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে। রক্ত দেওয়া বৃথা যাবে। মানসম্মান সব ধূলিস্যাৎ হবে। সর্বনাশ হবে!!

আচ্ছা আমি মুজাহিদগণের জন্য অনেক মাল, টাকা-পয়সা জমা করলাম। আল্লাহর প্রশংসা, তার দয়ায় আমাদের কাছে অনেক মাল আসল, যার প্রত্যক্ষদর্শী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই। যে এর হিসাব রাখবে বা নিবে। আমার এখানে এই সুযোগ ছিল যে, আমি সেখান থেকে এক পকেটে এক লক্ষ অথবা তিন লক্ষ ডলার ভরে নেব, আমি কি এবার ইয়াতিম

এবং অসহায়ের সম্পদ ভক্ষণ করব, ভোগ করব, আমি কি মুজাহিদ এবং নিরুপায়দের সম্পদ আত্মসাৎ করব? আর এ কারণেই বলছি, দীন হচ্ছে খোদাভীতির ওপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

উমর ইবনে আবদুল আযিযের তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল, তাকে একবার কেউ প্রশ্ন করল, আপনার পরিবারের অবস্থা কেমন, হে আমিরুল মুমিনিন?

তিনি প্রশ্ন শুনে বাতি নিভিয়ে দিলেন। প্রশ্নকারী বললেন, বাতি কেন নিভিয়ে দিলেন? উমর ইবনে আবদুল আযিয জবাব দিলেন, আমরা মুসলমানের টাকার তেল দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, মুসলমানের মালের হিসাবনিকাশ করার জন্য। আর এখন আপনি আমার পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি আমার পরিবার নিয়ে রাতে বসে গল্প করব। আর সেখানে মুসলমানের হিসাব করার জন্য জ্বালানো বাতির তেল খরচ করব?!'

ঠিক একেই বলে খোদাভীতি, একেই বলে তাকওয়া।

আর এখন তো অনেক দায়িত্বশীল, কী বলব? আল্লাহর কসম, রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ আসে। সে তা কর্জ বা অগ্রিমগ্রহণ করে লোক বা এলাকার রাস্তার কাজ করার জন্য, তার অর্ধেক সে আত্মসাৎ করে রাষ্ট্রের পাল্লায় ওজন হওয়ার আগেই। পৃথিবীর পুরোটাই বিনাশ হয়ে গেছে।

১৯৭৬ সালে মিশরি মুদ্রা শূন্যতায় চলে গেল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাজারে তার কোনো মূল্য নেই। মূল্যহীন পাউন্ড দিয়ে আপনি একটি ব্লেডও কিনতে পারবেন না। ইউরোপে মিশরের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হল, তার জন্য দশ মিলিয়ন মুদ্রা পাঠানো হল। এ পরিমাণ অর্থ কিন্তু প্রথমবারেই এসেছে! তখনো তার হিসাব-নিকাশ হয়নি। রাষ্ট্রীয় পত্রিকার হিসাব অনুসারে ১৯৪ অথবা ১৫০ উধাও, এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পত্রিকা থেকে তবে ১৯৪, ১৫০। আসল কত? তৎক্ষণাত দশ মিলিয়ন জানিহ মুদ্রা পাল্টে গেছে আবদুন নাসেরের একাউন্টে!

বর্তমানে তো যারা সম্পদশালী তারাই বিশেষ করে সম্পদ চুরি করে, টাকা পয়সা চুরি করে। এসব সম্পদশালীরাই প্রগতিশীলসমাজ, জনপ্রিয় ব্যক্তি

আরও কতকিছু, যাদের কেউ পথের ছেলে ছিল, ছিল ভিখারি, যার পকেটে পাঁচটা টাকাও থাকত না!!

হাফেজ আসাদ ১৯২৬-১৯৩৬ সালে যখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদেরকে শিষ দিত, তার পরনে তখন এমন পোষাক থাকত, যা পথের শিশুরা পরিধান করে থাকে। কপর্দকহীন সে এখন প্যান্ট পরিধান করেছে, যার ওপর আবার কোট। সাহিত্যকলেজে সে মেয়েদেরকে শিষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর হঠাৎ করেই একদিন সে জনগণের নেতা বনে গেল। হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। ভাবার বিষয় হচ্ছে, একসময় সে পাঁচটি সিরিয়ান টাকা পকেটে রাখার কত খাহেশ করত, আর এখন সে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা রাখছে! সে টিলার একটি সারি বিক্রি করেছে, যার সবগুলোর মূল্য হচ্ছে, ৯২ মিলিয়ন লিরা [সিরিয়ান মুদ্রা] অথবা তিরানব্বই মিলিয়ন লিরা। তার মানে কত রিয়াল হবে? প্রায় বিশ মিলিয়ন রিয়াল। পুরো টিলাগুলো সে বিক্রি করে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সে হাফেজ আসাদ নামে এগুলো গ্রহণ করে না। সে হাফেজ আসাদ এই নাম কাগজপত্র বা ফাইলপত্রে লিখে না, যেন অমুক অমুক ব্যক্তি এসব না জানে। সে তার নাম লিখে আলি আহমদ সালেহ। আর এভাবে আলি আহমদ সালেহ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়ে যায়। এক ধাক্কায় আসে, আরেক ধাক্কায় তার মালিকানায় পাল্টে যায়। আগামীকালই এই আসাদ রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলবে, তার ওপর আগুন জ্বলবে ইনশাআল্লাহ। তাকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। সে হাফেজ আসাদ মৃত্যুবরণ করেছে। হাফেজ আসাদের সন্তানদের মধ্যে সুলায়মান, তার ছেলের নাম সুলায়মান। তার নাম আবু সুলায়মান, কেন? এ নাম তার মামা সুলায়মান মুরশিদের নাম অনুসারে, যে কিনা নিজেকে খোদা দাবি করত। ফ্রান্সের রাষ্টদূত তার জন্য একটি কাপড় বানিয়েছে ইলেক্ট্রনিক বোতাম দিয়ে, যার মধ্যে সার্চলাইট ছিল। যখন সে এবং নুসাইরিরা এই রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রবেশ করত, তখন তার ওপর একটি আলোকধারা নামত। যখন তা আলোকিত হত, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তাকে সেজদা করত! [আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর!] আর তার পেছনে নুসাইরিরাও তাদের উপাস্যকে সেজদা করত! আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, সাবরি আসালি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সে সুলাইমান মুরশেদ খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। সাবরি আসালি তাকে আটকে রাখল এবং তার ফাঁসির রায়

দিল। তার ফাঁসি মঞ্চের কাছে সাবরি আসালি উপস্থিত হল, সে তাকে বলল- তারা আমাকে ফাঁসি দিতে চাচ্ছে। সে তখন ফাঁসির কাষ্ঠে বাঁধা, আপনি যদি আমার জন্য সুপারিশ করতেন! খোদা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর করুণা ভিক্ষা করছে! সাবরি আসালি তাকে বিদ্রূপ করে বলল, আগামীতে আমরা আপনার জন্য সুপারিশ করব। আবু সুলাইমান আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবে, সুলাইমান আসবে, মিনহাতিন ব্যাংকে যাবে এবং বলবে- 'আমি আমার বাবার টাকাগুলো চাই।' তোমার নাম কি? আমি সুলাইমান হাফেজ আসাদ। একাউন্ট দেখুন! তোমার বাবার একাউন্ট নাম্বার কত? বি আই ২২। খুলুন বি আই ২২। এ তো আলি আহমদ সালেহ। তোমার বাবা কি আলি আহমদ সালেহ? ইয়া আল্লাহ... তাড়াতাড়ি নিরাপদে স্থান ত্যাগ কর, এরপর টাকাগুলো ব্যাংকের মালিকানায় চলে যাবে। আর ব্যাংকও এসব টাকা সাধারণত গ্রহণ করবে না। এসব সম্পদকে কোনো কল্যাণ ট্রাস্টে ট্রান্সফার করবে। অথবা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দেবে বা আন্তর্জাতিক কোনো ইহুদিবাদী সংস্থায় দেবে। আর এভাবে বিশাল একটি অংকের টাকা বিনষ্ট হয়ে যাবে। বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

'জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গেই আছেন।' [সুরা তাওবা- ১২৩]

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.

'আর যখন কোনো সুরা, আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ বলে, এই আয়াত তোমাদের কার ঈমানকে বৃদ্ধি করেছে? সুতরাং যারা ঈমানদার, তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে। আর তারা সুসংবাদ গ্রহণ করছে।'

এখানে একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমান কথা এবং কাজের সমন্বয়। অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকার এবং ইসলামের আরকানের ওপর আমল করার নাম। আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে এবং গুনাহের দ্বারা

ঈমান কমে। এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। যদিও হানাফিগণ আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে শাব্দিক মতপার্থক্য করে থাকে। তারা বলে, আমল ঈমানের অংশ নয়। ঈমান বাড়ে না এবং কমে না। কারণ ঈমান অন্তরে তাসদিক বা সত্যায়নের নাম। আর তাসদিক বাড়েও না কমেও না। আমরা বলব- আমাদের তাসদিক কি আবু বকরের তাসদিকের মত?

‘আর যারা ঈমানদার, এ আয়াত তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে, আর তারা সুসংবাদ গ্রহণ করে।’ অর্থাৎ তারা তাদের চেহারায় আনন্দ প্রকাশ করে। (আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, কুরআনের আয়াত তাদের নাপাকিতে আরও নাপাকি বৃদ্ধি করে, আর তারা কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করে।) নাপাকি একটি ব্যাধি, দূরত্ব এবং ফাসেকি। তাদের নাপাকিতে আরও নাপাকি বৃদ্ধি করে, আর তারা কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করে।’

ফাসেকের জন্য এই কুরআন কতই না ভারি এবং ভীষণ ভারি বোঝা! ফাসেক, ফাজের এবং মুনাফিকের জন্য এই নামায, ইবাদত কতই না বড় বোঝা। এসব মুনাফিকদের জন্য নামায এক বোঝা। আপনি তাদেরকে বসে থাকতে দেখবেন, কোনো মজলিসে বা দহলিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে অথবা দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলছে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখন ঈমামের পিছনে পাঁচ মিনিট দাঁড়ায়, তা তার কাছে বুকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া পাহাড়ের ন্যায় মনে হয়। এতো অন্তরের রোগ, আল্লাহর কাছে আমরা তা থেকে পরিত্রাণ চাই। আর এ কারণে যখন আপনি আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করতে চাইবেন, তখন আপনি আপনার অন্তরকে কুরআন তেলাওয়াতের জায়গায় পরীক্ষা করে দেখুন। তা কি আপনার অন্তরে ভারি মনে হয়, নাকি না। ইবাদতের সময় নিজের অন্তরকে যাচাই করে নিন। সৎ ব্যক্তিদের সাক্ষাতের সময় নিজেকে যাচাই করে নিন। যিকির, শেষ রাতের নামাযের মাধ্যমে নিজেকে যাচাই করে নিন। নামাযে দাঁড়াতে নিজেকে যাচাই করুন। আপনার কি নামায ভাল লাগে? নাকি তা আপনার জন্য বোঝা মনে হয়? যদি তা আপনার জন্য বোঝা মনে হয়, তবে আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আল্লাহর আপনার অশুদ্ধ কঠিন অন্তরকে নরম বানিয়ে দেন।

এসব কথা প্রমাণ করে যে, জাহেলি বিষয় এখনো আপনার হৃদয়, মন আর অন্তরে বাসা বেঁধে আছে। অন্তরের কদর্যতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কদর্য অন্তর কামনা-বাসনাকে বাড়িয়ে দেয় কামনার তৃপ্তি। যৌনতার কামনা, যদিও তা হালালের মাধ্যমেই হোক না কেন। পেটের কামনা, যদিও তা হালাল খাবার দিয়েই হোক।

আর এ কারণেই সুফিগণ বলেছেন-
অন্তরের নম্রতা গ্রহণ করার জায়গা হচ্ছে ছয়টি বিষয়ে:

১. রাত্রি জাগরণে
২. কুরআন তেলাওয়াতে
৩. পেটকে খাবারশূন্য করার মাঝে
৪. সৎব্যক্তিদের সংস্পর্শে
৫. যিকিরের মধ্যে
৬. শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে।

হৃদয়ের নম্রতা এসব জায়গায় পাওয়া যাবে। আর এ কারণেই তারা যখন নিজের অন্তরের কদর্যতা বুঝতে পারতেন, তারা বলতেন, আমাকে এমন কাউকে দেখিয়ে দাও, যারা আমাকে আল্লাহর পথ বলে দেবে। মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তো তারাই, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তার অবস্থাই তোমাকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেবে। তার কথা আপনার আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে বাড়িয়ে দেবে। যখন আপনি তার দিকে তাকাবেন, তোমার আল্লাহর কথা স্মরণ হবে।

আমি মনে করছি যে, ইবাদত শরীরের শক্তি কিংবা দুর্বলতার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং তা নির্ভর করে অন্তরের শক্তি এবং দুর্বলতার ওপর।

আমি একবার সবার সঙ্গে জামাতে নামায পড়ছিলাম, আমার পেছনে কিছু যুবক ছেলে ছিল। তাদের মাঝে একজন বৃদ্ধও ছিলেন, যার বয়স নব্বইয়ের ওপরে হবে। তিনি কাফকাশ বা সিসান অঞ্চলের ছিলেন। আমি নামায শেষ

করলাম। আমি নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে ভালবাসি। কারণ, আমি প্রথমত নামাযে। এ কাজ আমার জন্য বোঝা মনে হয় যে, আমি দুটি বা তিনটি আয়াত পড়ব, তবে মানুষের বিষয়টা...।

আমি মানুষকে চিনি, যারা আমার পেছনে আছে, তারা স্বভাবতই বেশি কুরআন পড়াকে পছন্দ করে না। তারচে' গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমি যখন নামায শেষ করি, যুবকেরা অনেক সময় অভিযোগ করে। নিজেরা পরস্পরে এ নিয়ে কানাঘুষা করে। আমি তাদের কানাঘুষা শুনতে পাই। তবে এই বৃদ্ধ, যার বয়স কিনা নব্বইয়েরও ওপরে, তিনি আমাকে বললেন, যতবেশি পারেন, তেলাওয়াত করুন...। যার বয়স কিনা ৯০!

এখানে বিষয়টি হচ্ছে অন্তরের।

একবার রমজানে উস্তাদ বান্নার একজন ছাত্র আমার পেছনে নামায আদায় করল। আমি প্রতি রাতে এক পারা করে তেলাওয়াত করছিলাম। সে আমাকে বলল, কতটুকু তেলাওয়াত করেন। আমি বললাম, একপারা। সে বলল- কি আশ্চর্য! মনে হচ্ছে মিনিটখানেক সময় হয়েছে। নামাযের মধ্যে সে যেন বসতেই জানে না। কিন্তু অপরজন তো এমন যে, এই কুরআনকে সে আযাব মনে করে। আমি যদি ঐ যুবকের সঙ্গে রাত্রিভর নামায পড়তাম, তবে হয়ত সে এতটুকুও বিরক্ত বা ক্লান্ত হত না। আর অপরজন, সুবহানাল্লাহ! তার অন্তর কদর্য, কুরআন তার অন্তরে ঝড় তোলে, তার এতে কষ্ট হয়। আর এ কারণে তার অন্তর তাতে বিগলিত হয় না। আর এ কারণে যতই আপনি তেলাওয়াত করবেন, সে তত ভারি মনে করবে। নিজের ওপর বোঝা মনে করবে।

আর এ কারণে তার ওপর আল্লাহ তায়ালার বড় নিয়ামত আর অনুগ্রহ, যে মানুষের কাছে তার ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়, তা তার অন্তরে সজ্জিত করে দেওয়া হয়।...

আল্লাহ কুরআনে বলেন-

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ.

'তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা শুনতেন, তবে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের জন্য হৃদয়গ্রাহী বানিয়েছেন, কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বানিয়েছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়।' [সুরা হুজরাত: ৭]

এ তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিয়ামত। অর্থাৎ এ নিতান্তই বড় নিয়ামত যে, তিনি আপনার কাছে আপনার ছেলে-সন্তান, মা-বাবা, স্ত্রী-স্বজন সবকিছুর চেয়ে জিহাদকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন।

আপনি আপনার জীবনকে আফগানের পাহাড়ে কাটানোকে নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিতে কাটানোর ওপর প্রাধান্য দিতে পেরেছেন। এতো বড় নিয়ামতই বটে। সেখানের জীবন তো ভবিষ্যতের, কত ভোগ্য বিষয়, গাড়িতে চড়ে কাটানো পিৎজায় কামড় দেওয়া জীবন, সবকিছুই সেখানে বিদ্যমান! আর এখানে আপনি তার কী পাবেন?

আবু বুরহান এবং তার ব্যঙ্গ ও কঠোরতা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাকে সম্মানিত করুন, তিনি যে চেষ্টা করেছেন, তার বিনিময়ে ...! সুহাইব চল বাবা, হে অমুক, তুমি থেমে যাও। এতকিছু সত্ত্বেও মানুষ এই কঠোরতা এবং কদর্যতাকে মধুর মনে করে, কেন? আল্লাহ তায়ালার জন্য মিষ্টতা। সে তার মিষ্টতা অনুভব করে। শাস্তি, আল্লাহ তায়ালার জন্য দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিষণ্ণতা অন্তরসমূহের জন্য প্রিয় তখনই হবে, যখন তা অদৃশ্যের জ্ঞানীর সন্তুষ্টির জন্য হবে। আপনি কি নবিজির সেই বাণী শুনেন নি? তিনি বলেন-

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছেই আমার শক্তির কমতি, উপকরণের ঘাটতি এবং মানুষের ওপর আমার লাঞ্চনার ব্যাপারে আপনার কাছেই শেকায়েত ও অভিযোগ করছি।

হে আল্লাহ, আপনি দয়ালু, দয়াময়। আপনি অসহায়ের প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতিপালক?!

হাদিসটি নিয়ে যদিও কথা আছে, তবে তার কিছু অংশ সহিহ।

নবিজি আরও বলেন, আপনি আমাকে কার কাছে অর্পণ করছেন, ছেড়ে দিচ্ছেন? আমাকে কোন সুদূরে মুখ মলিন করছেন, নাকি শত্রুর হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন আমার বিষয়টি? দু-চোখ বেয়ে নবিজির অশ্রু বইছে, তার গোড়ালি বেয়ে রক্ত ঝরছে– অবশেষে তিনি তাকে বললেন, আপনি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন, তবে আমি কোনো পরোয়া করি না। বিষয় হচ্ছে, সন্তুষ্টি।

একজন আমাকে বলেছিলেন, এই যে সাংবাদিক, তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার একটি কিতাব দেখা যায়, যা তিনি মুহাম্মদ ইফসুফ হাওয়াশকে অর্পণ ও উৎসর্গ করেছেন। মুহাম্মাদ ইউসুফ হাওয়াশ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যাকে সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের ব্যাপারে এই ব্যক্তির ত্যাগ প্রশংসনীয়। তিনি দশ বছর জেলে কাটান, এরপর তারা তাকে ফাঁসি দেয়। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি জেলে ছিলেন। স্বাস্থ্যগত কারণে তারা তাকে কখনো কখনো বের করত, আবার জেলে ভরে রাখত।

আমাকে এ কথা জাবের বলেছিলেন। এই ব্যক্তিটির শাস্তি যখন সীমা ছাড়াত, তখন তিনি আসমানের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, আপনার ভালবাসায় সব সহজ হয়ে যায়। সবই আপনার ভালবাসায় সহজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ এসব শাস্তি আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার বদৌলতেই সহজ হয়ে যাবে।

আমাকে সাইয়েদ কুতুবের হিতাকাঙ্খীদের একজন বলেছেন, মিশরি একজন কৃষক জেলে বন্দী ছিলেন আসিয়ুত কারাগারে। তিনি স্বপ্নে নবিজিকে দেখলেন। নবিজি তাকে বললেন, 'তুমি আগামীকাল তুরাহ্ জেলখানায় স্থানান্তরিত হবে। সেখানে তুমি একজনের সাক্ষাত পাবে, যার নাম সাইয়েদ কুতুব। আরেকজনের নাম মুহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ। আমার পক্ষ থেকে তাদের দুজনকে সালাম জানাবে!!'

মিশরি একজন কৃষক, সে ফারুককেও চিনে না, আবদুন নাসেরকেও চিনে না। নবিজি তাকে বললেন, তাদের দু-জনকে বলবে, যদি তোমরা সন্ধি কর, বা নরমসুরে কথা বল এই তাগুতদের সঙ্গে, তবে ইসলাম তোমাদের সালাম জানিয়ে দূরে পাড়ি জমাবে!'

পরের দিন এই কৃষককে বাস্তবেই স্থানান্তরিত করা হল। সে ওখানে পৌঁছামাত্রই বলল, সাইয়েদ কুতুব কোথায়? পুলিশ তাকে আটকে রাখল এবং এই ভেবে তাকে প্রহার করতে শুরু করল যে, এ হয়ত আন্দোলনের কোনো পরিকল্পনা। তারা তাকে বলল, তাকে কী বলবে? সে তাদেরকে বলল, তার জন্য আমার কাছে একটি গোপন কথা আছে, আমি তোমাদের কাছে তা বলতে পারি না। তারা বলল, বাস্তবেই তার কাছে আন্দোলনের কোনো পরিকল্পনা আছে। তারা তাকে প্রহার করতে লাগল। সে তাদেরকে বলল, আমি অচিরেই তাকে দেখব, যদিও তাতে আমার মৃত্যু হয়!! সে তাদেরকে যখনই বলছিল, আমি তাকে অচিরেই দেখব, তারা বলছিল, অচিরেই আমরা তোমাকে দেখাব।

এ তো সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ-এর একটি কারামত যে, সেদিনই তার কাছে একজন সাক্ষাতকারী এল। সে তখন বাহিরে তাদেরকে বিদায় দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন বলে উঠল, সাইয়েদ কুতুব কোথায়? তারা তাকে মারতে উদ্যত হচ্ছিল। সে তাদেরকে বলল, ছাড় তাকে! তারা সাইয়েদ কুতুবকে ভয় করত! তাঁর কথায় তারা লোকটিকে ছেড়ে দিল। সে তাকে বলল, এখানে এসো। সে আসল। সে তাকে বলল, আপনি কি সাইয়েদ কুতুব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে তখনই তার হাতে, পায়ে চুমু দিতে শুরু করল। সে বলল, নবিজি আপনাকে বলেছেন, আপনার কাছে আরেকজন

ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে, যার নাম হাওয়াশ? তিনি তাকে বললেন, না, হাওয়াশ! [এখানে নাম উচ্চারণে লোকটি আরবি অক্ষর দুই চশমাঅলা হা-এর পরিবর্তে বড় হা উচ্চারণ করেছিল, তাই সাইয়েদ কুতুব তা শুধরে দিলেন!] সে বলল, সে বিজয়ী হয়েছে, বিজয়ী হয়েছে– সে কৃষক বলল, নবিজি আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি আপনারা আবদুন নাসেরের সঙ্গে নরমসুরে কথা বলেন, তবে ইসলাম আপনাদেরকে সালাম জানিয়ে দূরে পাড়ি জমাবে!'

সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, জাবের রুযাকের বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন, এই মুহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ এক আশ্চর্য ব্যক্তি। সে একজন নিরপরাধ মানুষ, তা সত্ত্বেও তিনি অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন। আর যখন তার সে শাস্তির পরিধি বেড়ে যেত, তিনি আসমানের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, এসব আপনার ভালবাসায়, এসবকিছু সহজ হয়ে যাবে।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا.

'যখন কোনো সুরা বা আয়াত অবতীর্ণ হত, তারা একজন অপরজনের দিকে তাকাত, তোমাদেরকে কি কেউ দেখেছে? এরপর তারা কেটে পড়ত।' [সুরা তাওবা- ১২৭]

কুরআনের বোঝা তাদের ওপর চেপে বসেছে। আর এখন তাই শয়তানেরা যখন কুরআন শোনে, ভেগে পালিয়ে যায়। এই কুরআন তাদের জন্য বিদ্যুতের ন্যায়, অক্সিজেনের ন্যায়, যা কিনা লোহাকে জ্বালিয়ে দেয়, লোহাকে গালিয়ে দেয়।

আল্লাহর কসম! আমি শয়তানের ওপরও কুরআনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছি। শয়তান জিন কাফের আমাদের এক ভাইয়ের ওপর আসর করেছিল। যখন তুমি কুরআন পড়তে শুরু করলে, সে চিল্লাতে শুরু করবে। সে কখনোই তা সহ্য করতে পারবে না। আমরা তাকে মসজিদের এ জায়গাতে নিয়ে এলাম, জায়গাটি নির্ধারিত ছিল না। আমরা তাকে সেখানে রাখলাম এবং কুরআন পড়তে শুরু করলাম, এতে জিন চিৎকার করতে শুরু

করল: হাসবুনাল্লাহ ও নি'মাল অকিল' আমি আমাদের সেই বেহুশ ভাইটির বুকে আঘাত করলাম এবং বললাম, হে কাফের বের হয়ে যা। সে বলল, আমি মুসলিম, আমি বেরিয়ে যাব, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। আমাদের সেই ভাইটি ছিল মিশরি। জিন সে মিশরি ভাষা জানত। উনিশ বছর যাবত সে মিশরে। হ্যাঁ। সে বলল- আমি বেরিয়ে যাব, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। সুতরাং সে তার পায়ের আঙুলের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভাবার বিষয় হচ্ছে, কুরআন তাদের ওপর বেজায় ভারি। আর এ কারণে উমর ﷺ যে উপত্যকা বা রাস্তা অতিক্রম করতেন, শয়তান ভিন্ন রাস্তা দিয়ে পথ ধরত। সে উমর ﷺ-কে ভীষণ ভয় করত। একবার উমর ﷺ-র আকৃতি ধারণ করে সামনে এল। উমর ﷺ তার সঙ্গে তিনবার ধস্তাধস্তি করলেন এবং তাকে ফেলে দিলেন, জিনকে তিনি তিনবার আছড়ে মারলেন। আর এ কারণে যেখানে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে জায়গা থেকে ভেগে যায়।

আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আছরের পর, আমরা আগামীকাল জুমআর দিন আসরের পড়ব। হামযা ﷺ-এর কাহিনীও জুমার দিন আছরের পরই সঙ্ঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা নিষ্ঠাবানদের তেলাওয়াতের বদৌলতে আমাদেরকে সাহায্য করলেন এবং জিনটি বেরিয়ে গেল।

ওখানে আর কিছু ভাই তাদের নিজেদের কিছু বিষয়ে অভিযোগ করলেন। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আছরের পর আমরা বসব এবং সুরা বাকারা তেলাওয়াত করব, হয়ত সালেহগণের বরকতে উপকার দেবেন। তবে যদি হয় আমার কথা, তবে আমি আমার নফসকে চিনি। আমার কাছে বেশ কয়েকবার জিনেরা এসেছে, আমি তাদের কোনো প্রতিকার করতে পারিনি। তবে হয়তবা কিছু সালেহ ব্যক্তির কুরআন তেলাওয়াতের বিনিময়ে, আপনাদের কারো নিষ্ঠার বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ভাইদের উপকৃত করবেন।

نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا.

'তারা একজন অপরজনের প্রতি তাকায়, তোমাদেরকে কি কেউ দেখেছে?'

তারা পরস্পরে চোখ টিপত, একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে বলত, তোমাদেরকে কেউ কি দেখেছে? অথবা দেখবে! তোমরা কি কারো চোখে পড়বে?'

তাদের নিকট বর্তমান এমন যে, তাদের কুরআন শোনার শক্তি ছিল না। আর এ কারণে তারা পরস্পরে আশ্রয় গ্রহণ করতে ঢুকে পড়ত, তোমাদেরকে কি দেখেছে? কিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল? মুহাম্মদ কিভাবে জানতে পারল, আমরা অমুক অমুক ছিলাম, আমরা যা গোপন করতে চেয়েছিলাম, যে বিষয়ে আমরা রাতে আলোচনা করেছিলাম, সে তা-ই বর্ণনা করছে?

هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.

'তারা একজন অপরজনের দিকে তাকাত, তোমাদেরকে কি কেউ দেখেছে? এরপর তারা কেটে পড়ত। আল্লাহ তাদের অন্তরকেও সত্য থেকে বিমুখ করে দিয়েছেন।'

আর এ কারণে তারা বলে, انصرفوا। বলা সমিচিন নয়, বরং তার পরিবর্তে انقلبوا। বলা উচিত। কারণ, এখানে কুরআনের সে অর্থ আছে, যা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে- فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ [তারা আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে গেছে।]

صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

'আল্লাহ তাদের অন্তরকেও সত্য থেকে বিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদের বোধশক্তি নেই।'

মুনাফিকের জীবন হচ্ছে, বিপদঘেরা। তাদের জন্য দুনিয়াতেও বিপদ, আখিরাতেও বিপদ। মিথ্যাবাদী মানুষের কাছে অপ্রিয়। তার পুরো জীবনটাই

উদাহরণ দৃষ্টান্ত। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– অপছন্দনীয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে তার প্রতি এক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আর যে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন; সুবহানাল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত পবিত্রতা আপনার জন্যই। সে যেখানেই থাকুক, মানুষের কাছে প্রিয়। কেন? মুমিন এমন ব্যক্তি, যে কোনো মন্দের উপমা নয়। মুমিনের কোনোকিছু দোষণীয় থাকতে পারে না। যা সে গোপনে করে, সে তা প্রকাশ্যেও করতে পারে। তার জন্য কোনো কাজ গোপনের এবং কিছু কাজ প্রকাশ্যের নেই। তার কোনো বিষয় গোপন, কিছু বিষয় প্রকাশ্য নেই। তার সবকিছুই এক। আপনি যদি তার কোনো গোপন বিষয়ে খবর নেন– দেখবেন, সে কল্যাণের কাজেই লিপ্ত রয়েছে। আর যদি আপনি রাতে তার ঘরে চুপিসারে যান, তাকে হয়ত নামাযে লিপ্ত দেখবেন, নতুবা ঘুমন্ত পাবেন, নতুবা সে রাতের শেষভাগে ইবাদতে লিপ্ত, কুরআন তেলাওয়াত করছে, তার এমন কোনো বিষয় নেই, যা দোষের। তার কাছে কোনো মেয়ে নেই মানুষের অজান্তে, যার সঙ্গে সে অশ্লীল কাজ করতে যাবে। তার কাছে কোনো সম্পদও নেই, যা চুরি করবে, যার জন্য সে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। তার প্রকাশ্যটা গোপনের মত। বরং তার বাতেন বা গোপন বিষয় তার প্রকাশ্য বিষয়ের চেয়ে উত্তম। তারা বলে থাকেন: 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বাতেনকে, আমাদের জাহের থেকে উত্তম বানিয়ে দিন। আমাদের প্রকাশ্য বিষয়কে সুন্দর করে দিন।' তার দোষের কিছু নেই। সে অভ্যন্তর থেকেই টইটম্বুর, শান্ত, সুখী।

আর মুনাফিক। সে সব সময় ভয়ে থাকে সব মানুষ হয়ত তার দোষ জেনে ফেলবে। তারা হয়ত তার গুনাহের কথা জেনে যাবে। আর এ কারণে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি বলে, আমাকে একটু ধর, আমাকে একটু ধর! কোথায়? তার সবই তো দোষ। সে মনে করে, এ হয়ত জেনে গেছে। সে হয়ত বুঝতে পেরেছে। তার পুরো জীবনটাই অস্থিরতা, পেরেশানি, চিন্তা আর সঙ্কীর্ণতার।

আর মুমিন যেমন- উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁, তিনি মিম্বারের ওপর ছিলেন, হঠাৎ অযু ভেঙে গেল। তিনি বললেন, হে মানুষেরা, আমি অপবিত্র হয়ে গিয়েছি, আমি অযু করতে যাচ্ছি, এখনই আবার ফিরে আসছি।

মুমিনের ভেতরটা এভাবেই পূর্ণ, যা মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উমর ﵁ একদিন জুমা ছাড়াই মিম্বারে আরোহন করলেন। লোকেরা তার আশপাশে একত্রিত হল। তিনি বললেন, হে লোকেরা! কয়েক বছর আগেও মক্কায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমি মানুষের ছাগল চড়াতাম। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি তো নিজের নফসকে মানুষের কাছে তুচ্ছ করছেন। তিনি বললেন, সেটিই আমার উদ্দেশ্য। আমার নিজের কাছে নিজেকে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছিল, তাই চিন্তা করলাম, আমি এই নফসকে লাঞ্চিত করব!!

আর বর্তমানে কী হচ্ছে? তাগুতি শক্তির অবস্থা এখন এমন যাদেরকে শয়তান ফুঁকে দিয়েছে। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে শয়তান এবং তার যাবতীয় মন্দ, যাদুটোনা থেকে, অহংকারের বাতাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুঁইয়ের মাথা ঠিক এভাবেই দম নেয়, যেমনভাবে বেলুন থাকে। হ্যাঁ! আর অবগতি অবশ্যই প্রয়োজন যে, তার নামেই খোলে, আর তার নামেই শেষ হয়। রাজকীয় সালামের মাধ্যমে শুরু করে, রাজকীয় এবং বাদশাহী সালামের মাধ্যমে তা শেষ করে। সূচনা করে একজনের প্রশংসা দিয়ে, অবশ্যই অমুকের প্রশংসা করতেই হবে। প্রথম পাতায় অমুক নেতার ছবি রাখতেই হবে। সবই ফা-ফু। এভাবে সে ফুলতেই থাকবে, এমনকি তা মানুষের সামনে বাতাসে ভরাই থাকবে। আর তাই, যখন বাতাস চলে যাবে, তখন তার বাস্তবতা প্রকাশ পাবে। থাকবে শুধু চামড়া, বেলুনের চামড়া। সে জমিনের ওপর নিজেকে আল্লাহর স্থানে নিয়ে বসিয়ে রেখেছে। সে মানুষের জন্য বিধি প্রণয়ন করছে, নিজেকে খোদা ভেবে বসেছে, আর তারা তা বাস্তবায়ন করেছে, তাদের কাজের মাধ্যমে তাকে খোদা বলে মেনে নিয়েছে। যদিও তা কথায় বলে না। কাজে করে দেখায়। আমরা অমুকের ছেলে অমুক সামনের এই বিষয়গুলো বিধিবদ্ধ করছি। অমুক বিষয়টি এমন। সে তো

কার্যত নিজেকে প্রভুত্বের দাবি করেই ফেলছে, যদিও তা মুখে বলে না। সুতরাং তা হাওয়া ভরপুর। তার জন্য অবশ্যই...।

মানুষের কাছে টেলিভিশনের মাধ্যমে আসার পূর্বেও মানুষ এভাবে ফোলাফাঁপাই ছিল। তাকে একটি জায়গায় অবশ্যই অবতরণ করতে হবে, সে তো পূর্বের দিনেই আছে। যদি সে এ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় না আসত, ধোকা প্রতারণা মধ্য দিয়ে, বয়ান-বক্তৃতা এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তবে সে কোনোকিছুরই যোগ্য হত না। আর হঠাৎ করেই সে একদিন রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে গেল। জি রাষ্ট্রপ্রধান, আলেম, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষালয়ের কর্তাবৃন্দ তার সামনে মাথা ঝোকায়। ক্ষমতা চালাচ্ছে, সম্পদ, রক্ত আর নারীর মাধ্যমে!

চত্বারিংশ মজলিস

আমরা আজ সুরা তাওবার শেষ দু-আয়াতে পৌঁছেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সুরা তাওবার তাফসির শেষ করতে পেরেছি। শেষ দুটি আয়াত এখানে আমরা পড়ছি-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

'অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসুল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টকর। তিনি তোমাদের জন্য মঙ্গলকামী, মুমিনের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তারই ওপর নির্ভর করি। আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।' [সুরা তাওবা: ১২৮-১২৯]

এই মধুর স্বর, ছন্দ দিয়ে এই কিতাল ও জিহাদের সুরাটি শেষ করা হয়েছে। কারণ, কিতালের সুরা আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুরা। যে সুরা কিনা কাফের, মুশরিক, মুনাফিকসহ ইসলাম, মুসলমান এবং আল্লাহ তায়ালার সমস্ত শত্রুর ওপর তরবারি কোষমুক্ত করেছে, উঁচিয়ে ধরেছে।

(তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল এসেছেন।)

এই আয়াত দুটি সম্পর্কে কেউ বলেছেন, মক্কি। তবে সুরার ভাবগতিতে, ধরনপদ্ধতিতে মনে হয় না, কথাটি ঠিক। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, আয়াত দুটি মাদানি।

উবাই ইবনে কাআবের বর্ণনা অনুসারে এ আয়াত দুটি কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত।

আপনারা কি উবাইকে চিনেন? নবিজি বলেছেন, তোমরা চারজন ব্যক্তি থেকে কুরআন গ্রহণ কর– তাদের একজন হচ্ছে উবাই ইবনে কাআব। উবাই ﷺ উমর ﷺ-এর শাসনকালে মদিনার ইমাম ছিলেন। তোমরা চারজন ব্যক্তি থেকে কুরআন গ্রহণ কর। উবাই ইবনে কাআব, সালেম (যে কিনা হুযাইফা ﷺ-র গোলাম ছিলেন), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবুদ দারদা।

এই বর্ণনাটি অর্থাৎ, 'তোমরা চারজন থেকে কুরআন গ্রহণ কর, তোমরা চারজন ব্যক্তি থেকে কুরআন গ্রহণ কর। উবাই ইবনে কাআব, সালেম (যে কিনা হুযাইফা ﷺ-র গোলাম ছিলেন), আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবুদ দারদা।' এ রেওয়াত তাদেরই।

এখানে আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত আছে, যেখানে মাআয ইবনে জাবাল আছেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে যায়েদ আছেন।

উবাই ইবনে কাআব বলেন, এই আয়াত দুটি আসমানের সঙ্গে কুরআনের সবচেয়ে কাছের, অঙ্গীকারের দিক থেকে। অর্থাৎ কুরআনে অবতীর্ণ সবার শেষের অংশ। কিন্তু ইবনে আব্বাসের ছাত্র সাঈদ ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। অত:পর তোমাদের সবাইকে তার উপার্জনের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।' [সুরা বাকারা- ২৮১]

যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন, নবিজিকে বলেন, এ আয়াতকে আপনি সুরা বাকারার ২৮০ আয়াতের মাথায় রাখেন।

আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে, সুদের আয়াতটি। তবে পূর্বে যে, ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে, এ উভয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় করা যেতে পারে যে, এখানে

ইবনে আব্বাসের যে হাদিস এবং সাঈদের যে রেওয়ায়েত: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ এ আয়াতটি সুদের আয়াতের পরেই রয়েছে, হয়তবা দুটি আয়াতই একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুদের আয়াতটি হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু এখনো বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। যদি তোমরা সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তবে যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এ ব্যাপারে তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না, তোমাদের প্রতিও অবিচার করা হবে না। আর যদি ঋণগ্রহিতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা মূলধনের দাবিও ছেড়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। অত:পর তোমাদের সবাইকে তার উপার্জনের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।'

সুতরাং এ দুটি আয়াত একটি আরেকটির অংশে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে এটি সবচে' প্রাধান্যযোগ্য বর্ণনা। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

'তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসুল এসেছেন।' তোমাদের মধ্য থেকে, আরব থেকে, তোমাদের [মানুষদের] মধ্য থেকে, অর্থাৎ সে তোমাদের আরবেরই মানুষ। আর এ থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহর রাসুল, নিরেট আরবের মানুষ। আর যেমনটি বলেছেন, তিনি তার সত্তা ﷺ

থেকে, আমি বৈধ বিবাহের দ্বারা জন্ম নিয়েছি, অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। এটি একটি বিশুদ্ধ হাদিস।

আদম আলাইহিস সালাম থেকে [বংশ পরম্পরায়] আমার মা-বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, আমাকে জাহেলি সভ্যতার কোনো অবৈধ কিছু স্পর্শ করে নি। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ধারাবাহিকতায় মা, দাদী, পরদাদীসহ আদম ﷺ পর্যন্ত কেউ যিনায় লিপ্ত হননি। বংশ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিস্কার আদম থেকে নিয়ে আমার মা-বাবা আমাকে জন্ম দেওয়া পর্যন্ত।

আল্লাহ তায়ালা হাওয়া ﷺ থেকে নিয়ে আমেনা পর্যন্ত সবাইকে পবিত্র রেখেছেন, তাদের কাউকেই অবৈধ কোনো সম্পর্কে স্পর্শ করতে পারেনি। আর উম্মাহাতুল মুমিনিনগণের পক্ষেও যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর তেমনিভাবে নবিদের স্ত্রীগণও যিনা ব্যভিচার করতে পারেন না। যেমনটি ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো নবির স্ত্রীই যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হননি।

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

ضَرَبَ اللهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا.

'আল্লাহ কাফেরদের জন্য নুহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছেন, তারা আমার সৎকর্মপরায়ণ দুই বান্দার অধীনে ছিল। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে খেয়ানত্ করেছিল। ফলে, নুহ এবং লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারেন নি।'

তারা দুজন খেয়ানত করেছিল দুই রেসালাতের এবং তারা যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন। তবে তারা যিনা করতে পারেন তা হতেই পারে না, এ হচ্ছে নবুওয়াতের মর্যাদা রক্ষার্থে। হ্যাঁ, কথা তা-ই বটে।

মূলত: আরবরা এ কথা অসম্ভবই মনে করত যে, কোনো স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মহিলা যিনা ব্যভিচার করতে পারে! আর এ কারণেই হিন্দা ﵂ যখন নবিজির কাছে ইসলামের ওপর বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলেন, তিনি নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন বিষয়ের ওপর আপনার কাছে বাইয়াত হব? মহিলাদের বাইয়াত ছিল ছয়টি শর্তের, কুরআনে তার ঘোষণা এসেছে এভাবে-

'হে আমার নবি, যখন আপনার কাছে কোনো মুমিন নারী বাইয়াত হতে আসে, তাদের বাইয়াত হল, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।'

হিন্দা বললেন, আমি বাইয়াত হলাম।

(এবং তারা চুরি করবে না।)

তিনি বললেন, আবু সুফিয়ান হচ্ছে কৃপণ ব্যক্তি। আমি তার সম্পদ থেকে আমার সন্তানের জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে থাকি। নবিজি তাকে বললেন, ঠিক আছে, তোমার জন্য এবং তোমার সন্তানের জন্য প্রচলন অনুসারে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিতে পার।

(আর তারা যিনা-ব্যভিচার করবে না।)

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মহিলা কি যিনা-ব্যভিচার করতে পারে?

মূলত জাহেলি সমাজের মানুষও এ বিষয়টি অপমানজনক মনে করত যে, তারা তার প্রতিবেশীর কোনো স্ত্রীর দিকে তাকাবে।

জাহেলি বীরত্বও বলে-

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي * حتى يواري جارتي مثواها

আমি তো আমার চোখকে অবনমিত করি, যখন আমার প্রতিবেশী আমার চোখে ভেসে ওঠে, যতক্ষণ না আমার সে প্রতিবেশী তার আব্রু ঢেকে নেয়।

আর এ অবস্থাটি ছিল কুরআনের সে বিধান আসার পূর্বে যে-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

'হে নবি আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখকে অবনমিত রাখে এবং তারা সে চোখকে তাদের লজ্জাস্থান থেকেও সংরক্ষণ করবে।'

যখন হাতেব ইবনে আবি বালতা কুরাইশদের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, ওহির মাধ্যমে নবিজিকে তা জানিয়ে দেওয়া হলে নবিজি আলি এবং জুবাইর ﷺ-কে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা দু-জন যাও একজন মহিলা একটি পত্র নিয়ে কুরাইশদের নিকট যাচ্ছে, তাকে তোমরা খাখ নামক বাগানের কাছেই পেয়ে যাবে, তার কাছেই চিঠিটি আছে। তারা মহিলাকে সেভাবেই পেলেন, যেভাবে নবিজি বলেছেন। তাকে আলি ﷺ বললেন, চিঠি বের কর। মহিলা বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আলি ﷺ তাকে বললেন, তুমি যদি চিঠি বের না কর, তবে আমরা তোমার কাপড় খুলে তোমাকে তল্লাশি করব। এবার মহিলাটি বলল, আমার থেকে তোমাদের চেহারা ফেরাও! সে চিঠিটি তার চুলের খোপায় রেখেছিল। এমনকি সাহাবাগণ তার বেণীর কিনারাও দেখল, সে তার চুলের বেণী খুলল এবং চিঠি বের করে আলি ﷺ-কে দিল।

জাহেলি সমাজের মানুষ পর্যন্ত যখন তারা কাবা ঘরের তাওয়াফ করত, তারা উলঙ্গ তাওয়াফ করত। এ বিষয়ে তাদের মূর্খতার প্রমাণ এই যে, তারা বলত, আমরা যে কাপড় পরিধান করে আল্লাহর নাফরমানি করেছি, তা পরিধান করে তাওয়াফ করব না। তাদের কারো যদি পয়সা থাকত, তবে তা দিয়ে সে একটি কুরাইশি কাপড় ভাড়া নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত। যদি কারো পয়সা না থাকত, তবে সে পরিধানের কাপড় খুলে ফেলত। যে কাপড় পরিধান করে সে গুনাহ করেছে, সে কাপড় সে খুলে ফেলত। এরপর আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করত। রাত ছিল মহিলাদের জন্য

আর দিন ছিল পুরুষদের জন্য। রাতে মহিলারা যখন তাওয়াফ করত। তারা বলত-

اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فلا أحله.

আজ শরীরের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণই প্রকাশ পাবে
আর যা প্রকাশ পাবে, আমি তা কারো জন্যই হালাল করব না।

আর এ কারণে সমাজ পবিত্র ছিল। আর তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

'হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চিনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত বা কষ্ট দেওয়া হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।' [সুরা আহযাব- ৫৯]

ব্যাপারটি তাহলে কী দাঁড়াল? (এতে তাদেরকে চিনা সহজ হবে, [তারা পর্দানশীন সম্ভ্রান্ত মহিলা] ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত বা কষ্ট দেওয়া হবে না।) তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।

উবাইদ সুলাইমানিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এর ধরন কী? তিনি বলেন, মহিলারা তাদের চেহারা ঢেকে নেবে। তিনি এক টুকরো কাপড় নিলেন এবং তা দিয়ে নিজের মাথা ঢাকলেন এবং নিজের চেহারাও ঢাকলেন। শুধু একটি চোখ খুলে রাখলেন।

(তাদেরকে চেনা সহজ হবে, সুতরাং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।) বিষয়টি কীভাবে? তারা স্বাধীন এবং বাদীর মধ্যে পার্থক্য করত, চেহারা ঢাকা দেখে, চেহারার পর্দা দেখে। সুতরাং যে তার চেহারা ঢেকে রাখত, সে

স্বাধীন সম্ভ্রান্ত রমনী আর যে তার চেহারা খুলে রাখত, সে বাদী বলে গণ্য হত।

আর তাই, উমর ﷺ যদি কোনো বাদীকে দেখতেন, সে তার চেহারা ঢেকে রেখেছে, তাকে প্রহার করতেন এবং বলতেন, তুমি কি স্বাধীন নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করেছ? (তাদেরকে চেনা সহজ হবে, সুতরাং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।) আর তাই, স্বাধীন মহিলাকে উত্যক্ত করা হবে না। তাদেরকে তো রাস্তার কুকুরগুলো নানা ধরনের কথা, টিপ্পনির মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে চলছে, গান বা ছন্দ সুরের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলছেন- (তাদেরকে চেনা সহজ হবে, সুতরাং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।) অর্থাৎ নিকটতম। সুতরাং স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারীকে কষ্ট দেওয়া হবে না। কেন? পুরুষেরা 'জানবে, বুঝে নেবে!' এরপরের অংশ হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, বিচার...।

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى * حتى يراق على جوانبه الدم.

কষ্টের কারণে তো কোনো সম্মানের পদ ছেড়ে দেওয়া হয় না
যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য, তা অর্জনের জন্য রক্ত প্রবাহ না হবে।

এমনকি ঐসব প্রেমিকেরা, যারা একে অপরকে ভালবাসত, কায়েস, লায়লা, লুবনা, কায়েস ইবনুল মালুহ এবং জামিল ইবনে মা'মার ও বুসাইনাহ।

জামিল একবার তার প্রেমিকাকে বলল, 'বুসাইনাহ আমাকে একটি চুমো দাও তো! বুসাইনাহ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা অস্বীকার করল। জামিল বলল, যদি তুমি আমাকে আমার কথা মত আমাকে চুমো দিতে, তবে আমি তোমাকে তরবারি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতাম।

মানুষেরা চারিত্রিকভাবে পবিত্র ছিল। তবে তারা জাহেল। একে ওপরকে ভালবাসে, প্রেমনিবেদন করে। আশেক-মাশুক। যদি প্রেমিকাকে না দেখে, তবে অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে যায়! হ্যাঁ, অসুস্থ হয়ে যায়! এ কারণে তিরস্কার করা হত, সবজায়গা থেকে বের করে দেওয়া হত, কিন্তু অনেক দূরে থেকেও তার পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করত, শুধু প্রেমিকার ছায়ামূর্তিটুকুই দেখার

জন্য, এতেই সে সুস্থ হয়ে যেত। হ্যাঁ, প্রেম একটি রোগ... তারা অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে যেত! প্রেম ভালবাসা, আল্লাহর কাছে অবৈধ। প্রেম সংস্পর্শ থেকে আশ্রয় চাই, তার শুরু তো ইচ্ছাধীন থাকে, কিন্তু তার পরিণাম হয় নিরুপায়ের। তার শেষ হচ্ছে, প্রেমরোগ! তবে শুরুতে তোমার ইচ্ছাধীন থাকে যে, তুমি তাকে প্রথমে দেখছ, এরপর ফোনে কথা হচ্ছে অথবা অন্যকোনো উপায়ে, কথা বলতে খুবই তৃপ্তি পাচ্ছ, এরপর পত্রালাপ। আর পরের দিন গড়িয়ে যাচ্ছে কথা বলে, ভেতরে এশ্‌ক ও প্রেম সৃষ্টি হচ্ছে, এরপর মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছ। তাকে দেখা ছাড়া আর জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ছে, তুমি এখানে কারণ এবং পরিণামের জন্য দায়ী, দুজনের গুনাহই তোমার ঘাড়ে চাপবে। আর এ কারণেই কিছু আলেম বলেন-

‘যে ব্যক্তি কারো প্রেমে পড়ল, তবে তা গোপন রাখল এবং তা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখল, এরপর সে মৃত্যুবরণ করল, সে শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল।’

এটিকে হাদিস হিসেবেও কেউ বলেছেন। তবে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদিসটি জাল ও বানোয়াট। তবে আল্লামা সুয়ুতি রহিমাহুল্লাহ শহিদের প্রকারের মধ্যে একেও গণ্য করেছেন। সৌভাগ্যের উপায় এবং শহিদের প্রকার।

যা হোক, বিষয়টি জাল হোক অথবা দুর্বল রেওয়াত হোক, এটি একটি রোগ। এর উপকরণ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে হবে, যেন আল্লাহ তোমাকে এ রোগে আক্রান্ত না করেন। তার কারণ হচ্ছে, মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে একটি মজবুত ভিতের ওপর। আর তা হচ্ছে, সতীসাধ্বী পবিত্র নারী। যদি এই ভিত আহত বা নড়বড়ে হয়ে যায়, তবে পুরো সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

আর এ কারণে ইসলামের শত্রুরা যখন ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাইল, তারা বিষয়টি নিয়ে ভাবল। তখন তুর্কিরা ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্ব দিত, তারা দেখতে চেষ্টা করল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র কোনটি, যার

ওপর নির্ভর করে অন্য রাষ্ট্রগুলো চলে, যার দ্বারা সবাই প্রভাবিত হয়, অথবা কারা এই ইসলামি বিশ্বের নেতৃত্বের লাগাম ধরে রেখেছে। তারা দেখল- তুর্কি হচ্ছে রাজনৈতিক রাজধানী, মিশর জ্ঞানের রাজধানী। তারা এ দুটি রাষ্ট্রে প্রবেশ করল, তাদের আক্রমণের কেন্দ্রে পরিণত করল, নারীদেরকে তারা টার্গেট করল। মহিলাদের পবিত্রতাকে তারা ধ্বংস করে, নারীদেরকে তারা চারিত্রিকভাবে শেষ করে দিল, তাদেরকে ঘর থেকে বের করল স্বাধীনতার নামে। পুরো সমাজের পতন হল।

তারা লিখেছে যে, মদের পেয়ালা এবং সুন্দরী নারী উম্মতে মুহাম্মদির ওপর হাজারও কামানের চেয়ে কঠিন ও কার্যকরী। একজন নর্তকী বা গায়িকা আমাদের কামানের চেয়েও শক্তিশালী। সুতরাং তোমরা নারিদেরকে তাদের ঘর থেকে বের কর এবং নষ্ট কর, ধর্ষণ ও বলৎকার কর...।

কোনোদিন একথা চিন্তাও করা যায় নি যে, কোনো মুসলিম নারী রাস্তার মাঝে মানুষের সামনে নাচবে! একশ বছর পূর্বে কোনো ইংরেজ হয়ত চিন্তাও করে নি যে, একজন মুসলিম নারী অনাবৃত মাথায় বাহিরে বের হবে। এ কথা মেনে নেওয়া যায় না কোনোভাবেই। কারণ, নারীদের স্বভাবপ্রকৃতিই তা গ্রহণ করবে না। তার লজ্জাই এ বিষয়টি অস্বীকার করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লজ্জামিশ্রিত করেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। নারীকে তো লজ্জাই পৃথক করে রেখেছে। আর এ কারণে, লজ্জা এবং ঈমান একটি আরেকটির অংশ। যদি একটি শেষ হয়ে যায়, তবে অপরটিও শেষ হয়ে যাবে। ঈমান না থাকলে লজ্জা থাকবে না, লজ্জা না থাকলে ঈমান থাকবে না।

হিমসের মহিলারা একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে প্রবেশ করল। তিনি বললেন, তোমাদের সমাজের নারীরাই তো বাথরুমে প্রবেশ করে- কারণ, তাদের সেখানে প্রতিটি বাড়িতে গোসলখানা, বাথরুম ছিল না- তারা বলল, হ্যাঁ। আয়েশা বললেন, আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- যে মহিলা তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্যকোথাও তার কাপড় খুলল, সে যেন তার মাঝে এবং তার প্রতিপালকের মাঝে নিজের আব্রুকে ছিন্ন করল। আজ মহিলারা দর্জির কাছে যাচ্ছে, নিজের উপরিভাগের পোষাক

খুলছে, এমনকি তার স্কার্টকে কোমর পর্যন্ত নিয়ে আসছে, যা কিনা খুবই সঙ্কীর্ণ।

আপনি যদি আপনার দাদীকে মিলিয়ন ডলারও দেন এবং বলেন, আপনি এই স্কার্ট বা ব্লাউজ পরিধান করে বাহির থেকে ঘুরে আসেন, সে কি তা কখনোই গ্রহণ করবে? তাকে যদি হাজার টাকাও দেন এবং বলেন, এটি ঘরের ভেতর পরিধান করুন, তাও কি তিনি কবুল করবেন? কোনোভাবেই তিনি তা গ্রহণ করবেন না। কারণ, এতে তার সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতি বিনষ্ট হবে।

আমাদেরকে জর্ডানের হরকাতুল ইসলামির নেতা উস্তাদ আবু মাজেদ পূর্ববতীদের অভ্যাস চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- আমার দাদী মৃত্যুর নিকটবর্তী পৌছে গেছেন। তার নাতী-নাতনীরা (তার মধ্যে আমিও ছিলাম) আশপাশে বসে আছে। তার রুহ বের হচ্ছে। তার জামার উপরের বোতাম আটকানো ছিল। আমরা তা খুলে দিলাম যেন তার রুহ সহজেই বের হতে পারে। সহজে দম নিতে পারেন। আবু মাজেদ বলেন, আল্লাহর কসম! আমার দাদী মৃত্যুর ঘাটে শুয়ে থাকা সত্ত্বেও তার রুহ বের হওয়ার মুহূর্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার হাত বের করলেন এবং বোতামটি ধরলেন এবং পুনরায় তা লাগিয়ে দিলেন।

আমার ভাই, লজ্জা এ তো স্বভাবজাত বিষয়। আর এ কারণে তারা পূর্বে বলতেন- আধুনিকতা। বেলাল ﷺ শাম থেকে ফিরে আসার পর আযান দিলেন, এমনকি আযান শুনে যুবতীরা পর্যন্ত তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তারা আযান শুনছে। বড় আধুনিকতা হলো মেয়েরা তাদের ঘরের দরজায় বেরিয়ে আসবে। তারা ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছে এবং মহিলাদের স্বভাব-চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

তারা আমিনাতুস সাঈদকে ইউরোপে পাঠাল, তাকে নিয়ে তারা ফ্রান্স ঘুরে বেড়াল। আমিনা ফিরে এল, স্টিমারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মাথার পর্দা খুলে ফেলল এবং পায়ের নিচে দিয়ে বলল, চিরদিনের জন্য অন্ধকারের যুগের সমাপ্তি ঘটেছে! আমিনা সাঈদ এখন পর্যন্ত একটি দৈনিকে লেখালেখি করে।

ভাবনার বিষয় হচ্ছে, তার কাজ হচ্ছে নিরাপদ বাসাটিকে ধ্বংস করে দেওয়া। যা কিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করবে। ঘর ধ্বংস হচ্ছে, পরিবার ধ্বংস, তারা নাটক আর সিনেমা তৈরিতে ব্যস্ত। পুরস্কার আজ ক্বারি, লেখক, আলেম এবং গবেষকদেরকে দেওয়ার পরিবর্তে এসব নষ্ট, নর্তকী, অসভ্যদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

আল্লাহর কসম! এসব লোক মিশরের জন্য জাহাফিল ইবনে গোরিয়ুন এবং দাইয়ানের চেয়েও ভয়ানক ক্ষতিকর! কারণ, ইসরাইলের বাহিনী মিশরের খাল পর্যন্তও আসতে পারেনি, তাদেরকে বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয়েছে, তারা এ কথা বলেনি যে, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছে। বরং তারা বলেছে- উম্মে কুলসুম তোমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আছে। ফিরুজ তোমার সঙ্গে ময়দানে আছে। আবদুল হালিম তোমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে আছে।

যখন তারা যুবকদেরকে সাইয়েদ কুতুবের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছিল, তারা বলল, সাইয়েদ কুতুব এই ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, তিনি উম্মে কুলসুমকে হত্যা করবেন, সুতরাং সে বন্দী হওয়ার যোগ্য। মন্দ এখন এমন মানুষের হৃদয় ও মনে স্থান করে নিয়েছে, যারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে থাকে, যারা ডক্টরেটের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

আমি একবার একটি কমিশন ও পর্ষদকে ডক্টরেটের পত্র দিলাম পড়ার জন্য, তারা আমার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করল। আমি একজন শায়খের কাছে গেলাম, যে এখন তার প্রতিপালকের নিকট আছে। দেখলাম সে উম্মে কুলসুমের অনুষ্ঠান খুলে বসে আছে। আমি তাকে বললাম– কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে ডক্টরেট দিবেন– হে শায়খ, গান সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, অশ্লীল গান মাকরুহ এবং হারাম। আর যদি তা নৈকট্যের হয়, তবে তা উত্তম।

সুতরাং এসব জ্ঞানপাপীরা কলেজ বানিয়েছে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে- চারুকলা। যেমন স্থাপত্য বিদ্যার জন্য পাঁচ বছর কাটানো হয়। তাদের সে চারুকলার একটি বিভাগ হচ্ছে আর্ট বিভাগ। এই আর্ট বিভাগের কাজ হচ্ছে,

একটি মেয়েকে আর্টের মঞ্চে দাঁড় করানো হয় এবং ভেতর বাহিরের সব কাপড় তারা খুলে ফেলে। তারা তার আকৃতি, আকারগঠন অঙ্কন করছে, মেয়েটি এখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সংবাদপত্রগুলো এসব ছবি একটি উৎপাদন, কর্মযজ্ঞ, মিশরীয় চারুকলা এবং জ্ঞানের উৎপন্নমতিত্ব হিসেবে গণ্য করে।

এক ঘন্টার জন্য মেয়েটিকে মিশরের দশ কারশ প্রদান করা হয়, যদি সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি ভেতরের পোষাক পরিধান করে দাঁড়ায়, তবে এক ঘন্টায় সাত কারশ প্রদান করা হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে নারীদের স্বভাব-প্রকৃতি তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা মানবতা, মনুষত্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মহিলাদের থেকে তা বিচ্ছিন্ন দেওয়া হয়েছে। আর এ কারণে তৃতীয় প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে, যারা মহিলাও নয়, আবার পুরুষও নয়। মহিলাদের শরীর বিকৃত হয়ে গেছে, তারা যে কাজ করে তার কারণে। তারা এখন গর্ভবতী হয় না। তাদের গর্ভধারণে বিঘ্ন ঘটছে। তাদের বুক এবং বাচ্চাদানীর হাড় সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যার কারণে তারা এখন আর গর্ভবতী হচ্ছে না।

আয়েশা বিনতে শাতিয়ি বলেন, আমি আমার এক বান্ধবীর কাছে গেলাম। দিনটি ছিল শনিবার। তাকে দেখলাম সে রান্নাঘরে থালাবাটি পরিস্কার করছে। আমি তাকে বললাম, এসব কী করছ? সে বলল, এ হচ্ছে, স্বভাবপ্রকৃতি। এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আমরা বিকৃত হয়ে গিয়েছি, কাজকর্মের মধ্যে পরিবর্তন আসার কারণে। পেশার কারণে আমাদের শরীর বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তাদের চেহারায় লোম প্রকাশ হতে শুরু করেছে, হ্যাঁ! আর এ কারণে আপনি অনেক ছাত্রীদের দিকে তাকান, দেখবেন, তারা খুব কমই উচ্চবংশীয় বা সম্ভ্রান্ত হয়, কারণ, তাদের শরীর বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এসব বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে বের করে দিয়েছে।

মুসলিম তুর্কি, যা কিনা সুলতান আবদুল হামিদের দেশ, ইসলামের দেশ, মুহাম্মদ ফাতেহের দেশ, তারা খবিস মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে নিয়ে এল, যখন তারা ফিলিস্তিনে এই চুক্তি করল যে, সে ইংরেজ সৈন্যদেরকে তুর্কি

সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ দেবে। বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সুযোগ দেবে। তারা তার সঙ্গে এবং ল্যানবির সঙ্গে একমত হল। সে তাকে বলল, আমরা তোমাদেরকে তুরস্ক অর্পণ করব, যখন তুমি তুরস্কে আক্রমণ করবে এবং আমরা তা ধরে রাখব, বাস্তব কথা হচ্ছে, তারা তুরস্ক অর্পণ করেছে অনেক নাট্যাভিনয়ের পর।

লুযানের যে চুক্তি ছিল ১৯২২ সালে সুইজখালের ব্যাপারে, সেখানে তারা চারটি শর্তের ওপর একমত হয়। তারা তাকে ইসলাম ও মুসলমানের দেশ ইসলামবোলকে তার কাছে অর্পণ করবে, যাকে তারা পরবর্তীতে নাম দিয়েছে, ইস্তাম্বুল করে। তার মূল নাম হচ্ছে ইসলামবোল। কিন্তু ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের হিংসার উদাহরণ যে, তারা ইসলামের উচ্চারণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তার আলোচনাও তাদের সহ্য হয় না। তাই তারা এর নাম পাল্টে দিয়ে ইস্তাম্বুল করেছে। আর এ কারণে খালেদ ইসলামবোলি, ইস্তাম্বুলি নয়। ইসলামবোলি হচ্ছে সহজ এবং শুদ্ধ।

তাদের সেই চারটি শর্ত ছিল, সে খেলাফতকে নিঃশেষ করে দেবে। সে ইসলামি নিদর্শন এবং মহিলাদের পোষাকের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অবস্থান নেবে। ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার সমস্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে সে লড়াই করবে। প্রতিহত করবে। ইউরোপীয় আইনকানুন বানাবে দেশের জন্য। কামাল আতাতুর্ক এর ওপর একমত হয়। আর তারা তার হাতে তুরস্ককে তুলে দেয়। সে খেলাফত ধ্বংস করে দিয়ে গণতন্ত্র ঘোষণা করে এবং সে তার কুকুরগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দেয়, যারা নারীদের লম্বা পোষাক ছিঁড়ে ফেলত। পুরুষের জন্য এমনসব পোষাক অবৈধ করা হয়, যে ডিজাইন আরব অথবা ইসলামি পোষাকের সাদৃশ্য হয়। টুপি যার মাথায় পাওয়া যেত, আদালতে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হত, যদি কেউ ইসলামি পোষাক পরত, তবে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত। তেমনিভাবে ইকাল পরিধানও কোনো তুর্কির জন্য অবৈধ ছিল। এভাবেই চলছিল হিযবুস সালামা ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত, যার নেতৃত্বে ছিল নাজমুদ্দিন আরবাকান। ইসলামি কিছু নিদর্শন তুরস্কে ফিরে আসতে শুরু করল। নাজমুদ্দিন আরবাকান এবং হিযবুস সালামা আসার আগ পর্যন্ত ষাট বছর রুমাল ব্যবহারও অপরাধ হিসেবে গণ্য হত, যার জন্য আদালতে বিচার হত।

একবার ইসলামবোলের শরিয়া কলেজের এক মেয়ে ওড়না পরিধান করে কলেজে গেল। সে এ পোষাকই পরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক হল, তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এ ওড়না পরিধান রাষ্ট্রের আইন বিরোধী। তারা বিচারটিকে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষামন্ত্রাণলায়ে নিয়ে গেল, রুমালের বিচার তাদের একটি রাতও পার করেনি। বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদে এবং রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত গিয়ে গড়াল। মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল যে, এই ওড়না ব্যবহার রাষ্ট্রের আইনের বিরোধী। হয়ত এই মেয়ে এই ওড়না খুলবে, নতুবা তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুলে ফেলা হবে!! শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুলে ফেলা হয়, তাকে বহিস্কার করা হল!!

আর এখন যদি আপনি ইসলামবোলের রাস্তায় যান, তবে আপনি বলতে পারবেন না, এ মহিলা কি ইউরোপের, সিরিয়ার, ফ্রান্সের, নাকি তুরস্কের! মোটেও বোঝবেন না!!

নারীসমাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর বাস্তবতা হচ্ছে, যখন নারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আপনি সমাজে ইসলাম ও তার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন, তখন তা বাস্তবেই বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে!!

আর এ কারণে যখন আমি ইসলামি সমাজের দিকে তাকাই, আমার মনে হয়, আমি একটি জায়গাকে সংশোধন করতে পারি, যার ওপর ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে তা হচ্ছে আফগানিস্তান। আমি আফগানের নারীদের মত কোনো নারী দেখিনি, কখনোই না! ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়ন করা সত্ত্বেও, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, যে তিক্ততা সে প্রতিনিয়তই গলধঃকরণ করছে এবং বঞ্চিত হয়েও কষ্ট আর রক্তের সাগর সে পাড়ি দিয়ে চলছে। এতকিছুর পরও সে তার নেকাব, পর্দা সংরক্ষণ করছে, পিতা হারিয়েছে, সন্তান হারিয়েছে, বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বিরান হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তাকে দেখার কেউ নেই; কিন্তু সে তার মূল ধরে রেখেছে। তা এখনো টিকে আছে, যা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি!! শত ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও!

বলা হয় মালদ্বীপ একটি ইসলামি রাষ্ট্র এবং তার রাষ্ট্র প্রধান মা'মুন আবদুল কাইয়ুম আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃভিসন্তান, অথবা আরও

কিছু। তার বড় মন্ত্রী পরিষদের কোনো একটি বৈঠকে আমি সে রাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, আমরা যথেষ্ট যত্ন পেয়েছিলাম, তার মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশই আযহার এবং সৌদির কোনো না কোনো শরয়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; কিন্তু আমি অনেক করে চেয়েছিলাম যে, মালদ্বীপে কোনো মাথা ঢাকা মহিলাকে দেখব! কোনো মহিলাই এমন চোখে পড়ল না, যার মাথা আবৃত!! মহিলারা একটি ঘাঁটি, সমাজের জাহাজ, বাহন যা কিনা বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মাঝে চলে। যদি জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে সমস্ত আরোহীর মৃত্যু সুনির্ধারিত।

আমি ফিরে এলাম। আমি একরকমের নিরাশ যে, আমাকে ইসলাম দেখতে এমন জাতির কাছেই যেতে হবে!

আরব উপদ্বীপে এখনো মহিলারা তাদের কিছু মূলকে ধরে রেখেছে, তবে তারাও যখন ইউরোপ, আমেরিকায় যায়, তাদের অবস্থাও পাল্টে যায়। অথবা যখন তারা প্লেনে চড়ে, তাদের কেউ কেউ ওড়না খুলে ফেলে, শুধু এই কারণে যে, সে প্লেনে এখন আধুনিক সমাজের চেয়ারে বসেছে! তবে তারা– আলহামদুলিল্লাহ– আবার যখন আরবে ফিরে আসে, অথবা ইয়ামানে তারা আবার নিজের অবস্থায় চলে আসে।

অর্থাৎ আমি আফগান নারীদেরকে দেখেছি, এরপর ইয়ামানে, এরপর আরবের অন্যান্য অঞ্চলের নারীদেরকে, তাদের মাঝে এখনো মৌলিকত্ব ও আভিজাত্য টিকে আছে। এখনো লজ্জা-শরম আছে। যদিও আরবে বিলাসিতার পোকা মহিলাদের বড় একটি অংশকে বা বলতে সমাজের অধিকাংশই কাটতে শুরু করেছে। তবে তারপরও কথা হচ্ছে, তারা তাদের লাজশরমকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তাদের এমনসব সেবার রীতি নিয়ম থেকে রক্ষা করুন, যা কিনা বর্তমানের অধিকাংশ পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কারণ আফগানের আভিজাত্য আর মৌলিকত্বের সংরক্ষণশীলা নারীরা তাদের লাজশরমের মাধ্যমে মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, আর পুরুষেরা এখনো মজবুত। তারা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নিকটতম রিসালাত এবং মৌলিকত্ব ও আদর্শ বহন করার জন্য। কেননা, মৌলিকত্ব বা

আদর্শ এমন সমাজ বহন করতে পারে না যারা যৌনতায় লিপ্ত, আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এ অসম্ভব! এমন প্রজন্ম যারা কিনা যৌনতার সাগরে নিমজ্জমান, তারা কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা বহন করতে পারে? সব হারিয়ে গেছে!

প্রতি সপ্তাহে ব্যাংকক থেকে ২০০ জন মানুষ আসে জাযিরাতুল আরবে, যাদেরকে প্লেন বহন করে নিয়ে আসে।

আর যখন তাদের ছেলে আফগানে আসে, তারা এখানে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের ছেলেরা আমেরিকায় যায়, ইউরোপে যায়, অথবা অন্যকোনো দেশে, আল্লাহ আপনার ওপর সন্তুষ্ট হোন, তারা ছেলের জন্য দুআ করে, নাও টাকা নাও লস এঞ্জালসে যাও এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া বা গণিত প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ কর। সে কথামত গেল– যেমনটি আমাকে নির্ভরযোগ্য কিছু ব্যক্তি বলেছেন– আবুল ওয়ালিদ সাউদি মুহাম্মদ মুনির উতাইবি রহিমাহুল্লাহ (যিনি ঈদুল ফিতরে জাজিতে শহিদ হয়েছেন,) তার বাবার তখন অনেক বয়স। তার কাছে কিছু লোক গেল, যারা কিনা তার অন্তরকে উত্তেজিত করছিল। তারা বলল- আপনি যান এবং অভিযোগ করেন মুহাম্মদ আলি আসাসের কাছে- ঐসব শায়খ, আলেম এবং মৌলবিরা আমার ছেলেকে আফগানে নিয়ে গেছে এবং তাকে হত্যা করেছে! তিনি প্রথমে ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসাও আদায় করেছেন। কিন্তু তারা তার চারপাশে নিন্দা, দোষারোপ করতে শুরু করল এবং প্ররোচিত করতে লাগল। এমনকি তাকে আমিরের দরবার পর্যন্ত যেতে বাধ্য করল। শেষপর্যন্ত তিনি মুহাম্মাদ আলির কাছে গেলে তিনি তাকে বললেন, আপনার আয়ু দীর্ঘ হোক। তিনি বললেন, জি। সে বলল- আমি অমুক, আমার ছেলেকে তারা আফগানিস্তানে নিয়ে গেছে এবং তাকে হত্যা করেছে– আমির মুহাম্মদকে আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্বের গুণ দান করেছিলেন। তিনি লিখেন- তার কথার উত্তরে মুহাম্মদ আলি বললেন, ব্যাংকক থেকে একটি প্লেন আসছে, যেখানে সাতটি লাশ আসছে, তার মাথা তখন ঘুরছে, তিনি তার অফিসের ম্যানেজারকে বললেন, প্যাকেটটি নিয়ে আসুন, অমুক মদ খেয়ে মারা গেছে, আমরা অমুককে আটক করেছি, সে মদ খেয়ে পালাচ্ছিল এবং মৃত্যুবরণ করেছে। অমুক ব্যাংকক থেকে মৃতাবস্থায়

ফিরে এসেছে অমুক কারণে, অমুক...! আর আজ আমাদের কাছে সাতটি লাশ এসেছে।

আপনার কাছে কে বেশি দামি, আপনার সন্তান যে আফগানে শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, নাকি যারা ব্যাংককে মৃত্যুবরণ করেছে? আপনি উঠুন, আমি আপনার চেহারাও আর দেখতে চাই না!!

যে ব্যক্তি বর্তমানে নিজের সন্তানের সম্পর্কের মিল দিতে পারে, সে কখনো এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করবে না। যদি সে জ্ঞানী ব্যক্তি হয় যে, সে তার সন্তান মর্যাদা, সম্মান, জিহাদ এবং লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছে, সে কখনো সন্দেহ প্রকাশ করবে না। আল্লাহর কসম, এ তো পৃথিবীতেও সম্মান, আখিরাতেও সম্মান, দুনিয়াতেও মর্যাদার, আখেরাতের মর্যাদা; এজন্য যে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়েছে। আর অন্যরা যেখানে মদ খেয়ে নাইটক্লাবে মরেছে!

আর এ কারণে তারা তাদের সমস্ত আক্রমণ নারীদের ওপর কেন্দ্রীভূত করেছে এবং তাদেরকে তারা ধ্বংস করে ছেড়েছে। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ধ্বংস করেছে শিক্ষাধারার মাধ্যমে, সিনেমায় উলঙ্গ ছবির মাধ্যমে!

এই তুর্কিদের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছিল হাখাম ইহুদি নাহুম হায়েম। আন্দোলনের ছক তৈরি করেছে। তুরস্ককে পরিচালিত করেছে এমনকি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। সে এভাবেই তুরস্ককে নিজের হাতে রেখেছে। নাহুম হায়েম যে কিনা লুযান চুক্তিপত্রের সব ছক তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। সে যখন রাস্তায় আসত, তখন নানা প্ল্যাকার্ড, প্রচারপত্র বহন করা হত- মাস্টার, প্রথম ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাতা, দার্শনিক ইত্যাদি। এর সবই নাহুম হায়েম ইহুদির সংবর্ধনার জন্য হত।

আর বর্তমানেও তুরস্কে তথ্যমন্ত্রণালয় ইহুদিদের হাতে। এই অপরাধী কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে শিক্ষামন্ত্রী বানিয়েছে এক ইহুদি মেয়েকে, যার নাম হচ্ছে খালেদা আদিব। যে কিনা এক ব্যভিচারিণী, সুন্দরী বেশ্যা। এই মেয়ের প্রেমিকা তাকে যুদ্ধের ময়দানে ডেকে পাঠাত, যুদ্ধের মধ্যেই তার কাছে চিঠি

পাঠাত এবং বলত, যখন এটি পৌছবে, তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমি বিজয় লাভ করব। এ মেয়েই কিনা তুরস্কের শিক্ষা ও সাংস্কৃতি মন্ত্রী, মুহাম্মদ ফাতেহের দেশে!!

নাহুম হায়েম যখন নিশ্চিত হল যে, সে তুরস্ককে ধ্বংস করতে পেরেছে, তাকে ইহুদিরা আদেশ দিল মিশরে চলে যেতে, সে মিশরে চলে গেল। ধনীদেরকে সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। চুক্তিকারীরা নাহুম হায়েমের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করত, এতে তাদের শিক্ষা পুরস্কার আটকে যেত। যখন কোনো একদিন কেউ তার সঙ্গে সাক্ষাত করত, পরের দিনই আবদুন নাসের তার জন্য শিক্ষা পুরস্কার ঘোষণা করত।

ইহুদি, ইহুদি..... এসব ইহুদিরা আমাদের ঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে, অথচ আমরা ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে বুঝতেও পারছি না, তারা যা নিজেদের আয়ত্ব করে নিয়েছে। উলঙ্গ নারীর ছবি, টেলিভিশন, আমার নেতা, তোমার নেত্রী, এবং চরিত্রহীনা লম্পটদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে, যা কিনা প্রতিটি ঘরে ঢুকে পড়ছে! শিশুদের বিদ্যানিকেতনে এবং প্রতিটি মহিলার খাটে খাটে!

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

(অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসুল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টকর।)

তিনি তাঁর উম্মতের কোনো কষ্ট দেখেন, তা তাঁর জন্য সহনীয় নয়, বরং কষ্টের। তাঁর কাছে এ বিষয় খুবই ভারি যে, তিনি তার উম্মতের ওপর কোনো মসিবত, বিপদ, ধ্বংস, লোকসান প্রত্যক্ষ করবেন। যা পতিত হচ্ছে তারা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়ার কারণে। আর যে কিনা পশ্চিমে বসবাস করে এবং পশ্চিমকে দেখে, সে নবিজির এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। কোনো মানবসত্তার জন্য সম্ভব নয় যে, সে তার মনুষত্বকে সংরক্ষণ করবে। কোনো সমাজের জন্যও সম্ভব নয় যে, তা মানবতাকে হেফাজত করবে, শুধু মানবতার দিকে তাকিয়ে, যদি না সে নবিজির অনুসরণ করে, অসম্ভব, অবাস্তব!!

ইউরোপে বর্তমানে সেসব ঘরকেও যিনা ব্যভিচার, অশ্লীলতার জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেসব ঘরকে সমাজের হেদায়েত এবং পথপরিক্রমার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। ইহুদিরা মানুষের অভ্যন্তরে যৌনতাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করে দিচ্ছে, আরও উস্কে দিচ্ছে। তারা আমেরিকান পুরুষদের কাছে আসছে, তার চেহারা ঢেকে দিচ্ছে, তার চোখ ছাড়া কিছুই প্রকাশ করছে না এবং টেলিভিশনে কথা বলছে। টেলিভিশনের মধ্যে সি বি এস, আই.বি.সি. সবই রয়েছে। সে আমেরিকান টেলিভিশনে বলছে, আমি আমার মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করেছি, যৌন কর্ম করেছি। মেয়ের সঙ্গে যৌনকর্ম খুবই আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তির!! জঘণ্য এই আমেরিকার টেলিভিশন! ধ্বংস, ধ্বংস, সবকিছুই তারা ধ্বংস করেছে!

তারা ফারবিড, ডাবির কায়েম, ডারউইন, মার্কসকে নিয়ে এল, শুধু এ কারণে যে, তারা ইলহাদ বা নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটাবে। জাতিসম্প্রদায় তাদের স্রষ্টা থেকে বিতাড়িত হবে বা হাত গুটিয়ে নেবে। তারা মানবজাতির মৌলিকত্বকে ধ্বংস করে দেবে। ফারবিড সে তাঁর নিজেস্ব মতের শিক্ষা দিচ্ছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমুন নাফস সম্পর্কে। ইলমুন নাফস, শরীরিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা বিভাগে। তারা যুবসমাজের জন্য যৌনতার পাঠ দিল যেন তাদের সমস্যা দূর হয়ে যায়। সে বলল- মা, মা আবার কী জিনিস? মা কী? সে বলল, গ্রন্থিবন্ধন এবং এল্যাক্ট্রা গ্রন্থিকে জ্ঞান হিসেবে আমাদের ছেলেদেরকে পড়ানো হয়। সে বলল- একটি ছোট ছেলে, যার কাছে গ্রন্থিবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে, কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে? সে বলছে, এই ছেলে চাচ্ছে, সে তার মা থেকে যৌনতার স্বাদ উপভোগ করতে, এই ছোট ছেলে, যার বয়স কিনা এক বছর। কিন্তু সে তার সামনে প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল দেখতে পাচ্ছে, আর তা হচ্ছে বাবা নামক এই অপচ্ছায়া মূর্তি। আর এর দ্বারা গ্রন্থিবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে বাবা এবং ছেলের মাঝে। তেমনি মেয়ে চায় সে তার বাবার সঙ্গে যৌনতৃপ্তি ভোগ করবে। কিন্তু সে তার মাঝে এবং বাবার মাঝে মায়ের ভয়ের অপচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে আর এতে করে তাদের মাঝে গ্রন্থি এল্যাক্ট্রা সৃষ্টি হচ্ছে।

এ হচ্ছে এক প্রকারের জ্ঞান যা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয়, যার জন্য আমাদের টাকাপয়সা খরচ করছি, আপনার পকেট থেকে আরও

অন্যদের পকেট থেকেও এর গারদ টানা হয়, আসবাবপত্রের রাজস্ব নেওয়া হয়। আর এর সবই নেওয়া হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ, শিক্ষকদের ভাড়া করার জন্য। আর তার শিক্ষকেরা হচ্ছে, কেউ ইহুদি, কেউ নাস্তিক। অথবা আরবের কোনো ইহুদি। আর তারা এই জ্ঞান আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে আপনারই টাকায়! প্রশ্ন ছুড়ছে, মা, মা সে কী জিনিস? মা, তার কিসসা কি আপনারা জানেন? সে বলছে, এ এক প্রকারের জ্ঞান, মানবসত্তার জ্ঞান। এ হচ্ছে আত্মজিজ্ঞাসার জ্ঞান। যেমনটা জাহাজ বানানোর নিয়মকানুনের জ্ঞান। সে বলছে, মা-ই প্রথম এই পৃথিবীতে পরিবার সৃষ্টি করেছে। তার সন্তানেরা মায়ের সঙ্গে যৌনাচার করতে চাইল; কিন্তু তারা তাতে একমত হতে পারল না, তারা মতপার্থক্য করল। তারা দেখল, তাদের মা এবং তাদের যৌনাচারের মধ্যে তাদের পিতাই হচ্ছে বাঁধা। তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। পিতাকে হত্যা করার পরও তারা তাদের মাকে উপভোগ করতে একমত হতে পারল না। তাই তারা বলল- তবে আমরা মাকে উপভোগ করতে হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হই। আর তাই, সে মাকে হারাম হওয়ার বিষয়টিকে একটি জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে পাঠদান করে থাকে, যে কিনা পশ্চিমের অবস্থাকে মহিলাদের অবস্থার মতই মনে করে।

আমাদের এক বন্ধু আমেরিকান এক মেয়েকে বিবাহ করল এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এল। আমার মা-বাবা বাড়িতেই ছিলেন। আমার বাবা সন্তানকে আদেশ করছিলেন- ব্যাটা, এটা আন, ওটা আন, শরবত নিয়ে এস, চা নিয়ে আস এভাবে আরও অনেককিছুর আদেশ। আমেরিকান এই মেয়ে এসব দেখে আশ্চর্যবোধ করল। সে বলল, এসব বুড়োরা কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে এভাবে আদেশ করছে! আমাদের সমাজে তারা বয়োবৃদ্ধ, তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়! এসব ছেলেমেয়েরা কীভাবে তাদেরকে সম্মান করছে, তাদের আনুগত্য করছে? তারা তাকে বলল, এ হচ্ছে ইসলামের আদর্শ। তাদের আনুগত্য ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই মহিলা এ বিষয়ে অজ্ঞ। আমার বাবার বয়স সাতাশি বছর, মায়ের বয়স পঁচাশি বছর। এসব সন্তানেরা কীভাবে তাদের আনুগত্য করে বাড়িতে? এসব বড় বড় সন্তানেরা তাদের আনুগত্য করছে। আমার স্ত্রী আমার বাবা-মায়ের আনুগত্য করছে? এসব কীভাবে সম্ভব? সে এসব দেখে

বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কারণ, সে দেখেছে, তার দাদা-দাদী বা মা যেই হোক না কেন, তাদের সন্তানেরা তাদের থেকে দূরে, পুরো একটি বছর চলে যায়, কেউ তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে না। কেউ আসে না। গাড়িতে চলতে পিতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, রাস্তায় তার পিতাকে দেখছে গাড়িতে; কিন্তু বাবাকে একটু সালাম দেওয়ার জন্যও দাঁড়ায় না।

একদিন ইশারায় দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। বাবা এবং ছেলের গাড়ি। বাবা তার গাড়ি থামিয়েছে, যেন ছেলে একটু থেমে গাড়ি থেকে নেমে তাকে একটু সালাম দেয়! হায় আশ্চর্য! ছেলে বলে উঠল- হাই, বাই বাই! এবং সে চলে গেল, একটুও থামল না। এতে বাবার চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। কেউ একজন তাকে বলল, কী খবর? সে বলল, পাঁচ বছর যাবত আমি আমার এ ছেলেকে দেখি না, যে কিনা আমাকে হাই এবং বাই বলে চলে গেল!

আর তাই তো এই পশ্চিমা সমাজ একটি দিন নির্ধারণ করেছে, কী নাম দিয়েছে তার? মা দিবস। অর্থাৎ বছরে একটি দিন আমরা মায়ের সঙ্গে দেখা করব, আমরা তার জন্য ফুলের তোড়া, এক টুকরো কেক নিয়ে যাব এবং বলব, এটুকু খাও, ফুলের ঘ্রাণ নাও এবং আগামী এক বছরের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা কর!!

হ্যাঁ, আমিও মা দিবস দেখেছি। আমাদেরই একটি গ্রামে রাতভর তারা তাদের মা-বাবাকে সামনে নিয়ে বসে থাকল। সকালে সিদ্ধ জব, দুপুরে ভাত, সন্ধ্যায় একটু তাজা দুধ। সারাটি দিন তার সামনে তারা কাটাল। পরের দিন তার জন্য ঈদ উদযাপন করল, হায় অসহায়ত্ব!

অনুসরণ, পাশ্চাত্যের অনুসরণ, ঘৃণিত অনুসরণ। ভাই আমার, শাফেয়ির অনুসরণ আর আবু হানিফার অনুসরণ ঘৃণিত!? এ তো বানরদের ন্যায় অনুসরণ। কারণ, বানরের তাই নকল করে যা তারা দেখে!!

আর এ কারণে যখন কোনো ইউরোপিয় মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে, যথার্থভাবে তাকে মেনে চলে এবং কোনো মুসলমানকে বিবাহ করে, এবার সে একটু সময়ের জন্য তার স্বামী থেকে ছিন্ন হতে পারে না। কারণ, সে

তাকেই পুরো পৃথিবী জ্ঞান করে। সে তো পূর্বে ধ্বংসস্তূপেই পরিণত হয়েছিল। কেউই তার সঙ্গে কথা বলত না!

আমাকে এক ভাই বলেছেন, সে আমেরিকায় ডক্টরেট করছিল। সে বলল, আমি এক বৃদ্ধার বাড়িতে ছিলাম। অর্থাৎ যে বাড়িতে থাকতাম, তা একজন বৃদ্ধার বাড়ি। আমি প্রতিদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে তাকে শুভসকাল বলতাম, আবার সন্ধ্যায় এসে শুভ সন্ধ্যা বলতাম। তার বয়স সত্তরোর্ধ্ব হবে। বড় কথা হচ্ছে, সে বয়োবৃদ্ধা। ঐ মহিলা আমাকে দুদিন বা তিনদিন পর ডাকল এবং বলল, তুমি কত টাকা মাইনে চাও? আমি তাকে বললাম, কেন? সে বলল- কারণ, তুমি আমাকে সালাম দাও। আমাকে তুমি অভিবাদন জানাও। আমি ভাবছি, আমি তোমাকে একটি মাইনে দেব। কারণ, আমি মানুষের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!!

আর এ কারণেই, এই নির্জনতা দূর করার জন্য তারা তাদের সেখানে কুকুর রাখে। আর তারা আপনাকে বলবে, সবাই আমার সঙ্গে গাদ্দারি করেছে এবং ছেড়ে গেছে, এই কৃতজ্ঞ কুকুর ছাড়া আমার কাছে আর কেউ নেই। হ্যাঁ, এই কুকুর ছাড়া কেউ নেই। সে বলবে, এ কুকুর আমার সন্তানের চেয়ে উত্তম। কারণ এই কুকুর ছাড়া আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। আর এ কারণে, অনেক বৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধা তাদের ঘরে মারা যায় অথচ তাদের মৃত্যুর কথা কেউ জানে না, যতক্ষণ না তাদের থেকে পঁচাগলার গন্ধ বের হয়, সে লাশের গন্ধ নাককে আক্রান্ত করে। তারা রাষ্ট্রের কাছে যায়, প্রশাসনকে ডেকে নিয়ে আসে, এখানে এসো, এখানে এই গরমে কেউ একজন হয়ত মারা পড়েছে। জলদি এসো, তাকে নাও এবং কোথাও নিয়ে নিক্ষেপ করে এসো!

ঠিক এভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসনের বাবা তার খামারে মৃত্যুবরণ করল, কেউ তার মৃত্যুর কথা জানল না। তার মৃত্যুর খবর দেওয়ার জন্য তার কুকুর ছাড়া কেউ ছিল না। অথচ তার ছেলে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!!

আর এ কারণে সমাজ আজ চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে। মেয়ে কাঁদছে অথচ তার বাবা তাকে ফেলে যাচ্ছে। একজন আরবি তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী? বাবা বলল, তার মেয়ে চাচ্ছে তার বাবার থেকে ১০০ ডলার দিয়েই একটি

রুম ভাড়া নেওয়ার জন্য অথচ একজন যুবক সে রুমটি পাঁচশত ডলারে নিতে প্রস্তুত। তাই, আমি এই কক্ষটি সেই ছেলের কাছেই ভাড়া দেব!

আর এ কারণে তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের হওয়া সম্ভব নয়, যা কিনা সে তার বাবা বা বন্ধুর দিকে এগিয়ে ধরবে। ব্যস সে ধূমপান করছে। যেমনটি এই ভাই বুঝেছে, এক ভাই আমেরিকা থেকে আগমন করছে, সে আমাকে বলল, আমাদের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ রয়েছে, লজ্জা এবং সম্মান দান। এ দুটি গুণ ইউরোপের মানুষ থেকে বিতাড়িত হয়ে গিয়েছে।

এক আরবি এক আমেরিকানকে দাওয়াত দিল! তার জন্য সকালের নাস্তা বানাল এবং সেখানে গোস্ত ইত্যাদি প্রস্তুত করল। সে আমেরিকান তার কাছে দু-ঘণ্টা অবস্থান করল। ফলফ্রুট খাচ্ছিলেন এবং গল্প করছিলেন। এরপর তাকে বিদায় জানালেন। আমেরিকান বেরিয়ে গেল, যাওয়ার সময় একটি কার্ড রেখে গেল, আরবি সে কার্ডটি পড়ে দেখল, লিখা আছে, আমি আপনার ওখানে দু-ঘণ্টা অবস্থান করেছি। এক ঘণ্টায় আমার পারিশ্রমিক বিশ ডলার। আশা করি, আপনি আমাকে চল্লিশ ডলার দিয়ে দেবেন। সমাজের চূড়ান্তরূপ। কিন্তু লোহার ঝনঝনানি, ইস্পাতের ঝঙ্কার, বিমানের গর্জন এখনো এ ধ্বংসশীল সমাজের ওপর পর্দা ঝুলিয়েই রেখেছে। মহাকাশ, পরমাণু, আমেরিকা, আরসু পোল্যান্ডের চুক্তি, আটলান্টিকা, বাসফেকি, বালাসফেকি চুক্তি, সবই শুধু নামস্বর্বস্ব। এমনসব নাম যার দ্বারা অন্ধকারকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আবর্জনার টিবির ওপর, যেদিকে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে, ফিরে গেছে, গোবরের স্তুপের ওপর স্বর্ণের কত টুকরো রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনারা আল্লাহর প্রশংসা করুন, তাঁর দীনের জন্য, ইসলাম পেয়ে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

ইউসুফ আজম বলেন, আমি আমেরিকায় ছিলাম। একবার আমি এবং আমার স্ত্রী গাড়িতে উঠলাম। ইউরোপ, নাকি আমেরিকা ভুলে গেলাম, যে গাড়ি চালাচ্ছিল, সে একজন মহিলা। আমি তাকে বললাম, তুমি কেন গাড়ি চালাচ্ছ? গাড়িচালককে আলাদা পোষাক পরতে হয়, সে আমাকে বলল, গাড়ি যদি না চালাই, তবে জীবিকার কী ব্যবস্থা হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম,

তোমার কি স্বামী নেই? আমার যদি স্বামী থাকেও, সে কি আমাকে পয়সা দেবে? আমি বললাম আচ্ছা? আমি বললাম, দেখ, এ হচ্ছে আমার স্ত্রী, আমার কাছেই স্কুলে চাকরি করে, আমি স্কুলের পরিচালক, সে আমার স্কুলের শিক্ষিকা। আমার স্ত্রী মাস শেষে তার বেতন নিয়ে নেয় আবার আমি তাকে তার ভরণপোষণের খরচ দেই, যা সে খরচ করে। আর তার বেতনের টাকা ব্যাংকে জমা করে। সে বলল, এটা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? এ তো বোঝে আসে না। সে তাকে বলল, তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল। সে বলল, এমন নিয়মকানুন এমন কোনোকিছুও কি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে? তারা তাকে বলল, হ্যাঁ, এমনকিছুও আছে পৃথিবীতে।

আর এ কারণেই পাশ্চাত্য এবং প্রাশ্চাত্য জগৎ, রাশিয়া এসবকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। আর তাই, উদাহরণ পেশ করা হয় কম, লাঞ্ছনা এবং কালো সুরমা। হ্যাঁ, চারদিক থেকেই বিপদ ঘনিভূত হচ্ছে, সারাটি দিন সে ক্ষেত চাষ করে চলছে...।

একচত্বারিংশ মজলিস

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

'নিশ্চয় তোমাদের থেকেই তোমাদের নিকট রাসুল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপর তারা যদি বিমুখ হয়, তবে আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

আমরা গত আসরে মানবজীবনে নবি করিম ﷺ-এর প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে, কোনো মানুষ নবিজির আনীত হেদায়েত অনুসরণ করা ব্যতীত কোনোভাবেই শান্তি পেতে পারে না; বরং অসম্ভব। কারণ তিনি যে নিয়মকানুন আর শরিয়ত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, তা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে। আল্লাহর কাছে কোনো প্রবৃত্তি নেই, যা একদিকে ঝুঁকে তো অন্যদিকে ঝুঁকে না। এ তো ন্যায়পরায়ণ সত্তা, তিনি সর্বজ্ঞ, কালের যা কিছু নব আবিষ্কৃত হয় এবং এই কাল যে সমস্ত মুশকিলাত ও সমস্যাবলী বহন করে চলে। তিনি সে সমস্যার সমাধান অবতীর্ণ করেন। তিনি এমন পবিত্র জ্ঞানী সত্তা, যার মধ্যে অজ্ঞতার কোনো ছোঁয়া নেই। তিনি ন্যায়পরায়ণ, তার কোনো অত্যাচার নেই, তিনি প্রজ্ঞাবান এবং তিনি পথভ্রষ্ট হন না। আর তাই মানবজাতিকে তাঁর যাবতীয় বিধান, আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক জরুরি। আল্লাহ তায়ালার যে বিধান নিয়ে রাসুল এসেছেন, তা যদি কেউ না মানে, তবে সে পৃথিবীতেও দুর্ভোগ পোহাবে, কষ্ট করবে এবং পরকালেও তা তার পিছু ছাড়বে না।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন-

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

'তিনি বললেন, তোমরা (আদম আ. ও শয়তান) তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না।

আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার জীবনজীবিকা সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কুচিত হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উত্থিত করব!'

পথভ্রষ্টও হবে না এবং সে দুর্ভাগাও হবে না, যে আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করবে সে সৌভাগ্যবান হবে, আরাম এবং নিশ্চিন্তে থাকবে। আল্লাহ তার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং মেধাকে সংরক্ষণ করবে। তার সত্তা, শরীর, আত্মা, নিরাপত্তা, আরাম, প্রশান্তি সবকিছুই শরিয়তের আনুগত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এমনকি তার মেধাযোগ্যতা, বিজয়, সাহায্য, তারও ওপর বৃষ্টির বর্ষণ, রিযিক, সবই আল্লাহর আনুগত্যের শেকলে বাঁধা।

একটি কবিতায় ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

شكوت إلى وكيع سوء حفظي * فأوصاني إلى ترك المعاصي

فإن العلم نور من إلهي * ونور الله لا يعطى لعاصي

আমি ইমাম ওকিয়ি রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট আমার মেধাশক্তির ঘাটতির কথা জানালাম, তিনি আমাকে গুনাহ ত্যাগ করার জন্য অসিয়ত করলেন।

কারণ ইলম হচ্ছে আল্লাহর নুর, আর আল্লাহর নুর কোনো গুনাহগারকে দেওয়া হয় না।

মালেক রহিমাহুল্লাহ শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহকে বলেন, হে বৎস আমি দেখছি, আল্লাহ তোমার অন্তরে তাঁর নুর ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তা গুনাহ দ্বারা নিভিয়ে দিও না। এ কথা তিনি তার মেধা দেখে বলেছিলেন।

বিজয় এবং পরাজও এই আনুগত্যের শেকলেই বাঁধা.....

আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا.

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চাদপদী হয়েছে যুদ্ধের দিন, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে, তাদের অর্জিত গুনাহের কারণে।' [সুরা আল ইমরান- ১৫৫]

গুনাহের কারণে, জি, গুনাহের কারণেই তাদের সেই পরাজয় হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালার রিযিকও আসে এই আনুগত্যের কারণে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

'যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আসমান-জমিনের বরকাতের দরজা উন্মুক্ত করে দিতাম।' [সুরা আরাফ: ৯৬]

শক্তি অর্জন হয় এই আনুগত্যের মাধ্যমে। কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে-

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ.

'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আর শক্তি দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন।' [সুরা হুদ- ৫৬]

ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে এবং তার নাফরমানিতে তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে 'শত্রু থেকে বাঁচার উপায়' শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছে এই বিষয়ের উপকারিতা বর্ণনা করে।

আমি পূর্বের শর্তসমূহের মধ্যেই এর সম্মুখীন হয়েছি। এমনকি মানবদানব এ বিষয়টি ভয় করে চলে। মুমিনকে তারা ভয় করে, যখন সে আল্লাহর আনুগত্য করে। সংক্ষেপে বলতে হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, সবাই তার আনুগত্য করে। আমি আপনাদেরকে বলেছি, একদিন উকবা ইবনে নাফে কাইরুয়ান শহর নির্মাণ করতে ইচ্ছা করলেন একটি গভীর জঙ্গলে। তিনি দু রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, হে ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণীরা, জীবজন্তুরা, হে বিষাক্ত পোকামাকড়, সরিসৃপ, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর বাহিনী। আমরা ইচ্ছা করেছি যে, এ বনে প্রবেশ করব। সুতরাং তোমরা এখান থেকে বের হয়ে যাও। কয়েক মিনিটমাত্র হয়েছে। জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদেরকে বহন করে চলছিল এবং তাদের জন্য বন খালি করে দিল। যে আল্লাহর আনুগত্য করে, সমস্ত প্রাণী তার আনুগত্য করে! প্রতিটি জিনিস তার আনুগত্য করে।

সাহাবায়ে কেরাম তখন পারস্যে ছিলেন। তারা কেউ ফারসি জানেন না, রোমান ভাষাও জানেন না, না জানেন সুরিয়ানি ভাষা। একজন সাহাবি ফারসি ভাষায় কথা বললে পারস্যের লোকটি পালিয়ে গেল। অথচ সে সাহাবি ফারসি জানে না এবং পশতুও জানে না। যখন পারস্যের তারা পালিয়ে গেল, সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে ধাওয়া করে ধরে ফেললেন এবং বন্দী করলেন। তাদেরকে বললেন, তোমাদের কী হল, তোমরা পালালে কেন? তারা বলল, আমরা তোমাদের সঙ্গীর মুখে বলতে শুনেছি যে, তোমরা

আমাদেরকে খাওয়ার জন্য এসেছ! তাই, আমরা পলায়ন করেছি। কী বললে? সে বলল, আমি জানি না। ফেরেশতা তার ভাষায় কথা বলেছে। আমরা এ নিয়ে আলোচনা করি যে, সাকিনা হযরত উমরের মুখে কথা বলে। অর্থাৎ ফেরেশতা। ফেরেশতা তার নামে কথা বলে।

আর তাই তো শয়তানও কখনো মানুষের ভাষায় কথা বলে, যখন সে রাগ বা এমন কোনো পরিস্থিতিতে থাকে। আর তাই তো নিজের মধ্যে যখন রাগের ভাব হয়, তখন অযু করা মুস্তাহাব, যেন শয়তান বিতাড়িত হয়ে যায়। কারণ শয়তানকে আগুন ছাড়া অন্যকিছু নির্বাপণ করতে পারে না।

সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে শান্তি। মানুষ কীভাবে তার আনুগত্য না করে জীবন ধারণ করবে, ভাই, আমি ভেবে অস্থির হই!..

বর্তমানে আমেরিকা যখন কোনো সমস্যায় পতিত হয়, তখন সে কী করবে? গির্জায় যাবে?! অনেকদিন যাবৎ তারা তাকে ছেড়ে রেখেছে, তারা কি এখন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে? ইহুদিরা বলে, আমরা খৃস্টানদের মাথা থেকে আল্লাহর ফিকির বের করে দেব, তার পরিবর্তে সেখানে আমরা টাকা-পয়সার হিসাব বসিয়ে দেব। আমেরিকা কি রাত্র জাগরণ করবে, তারা আল্লাহকে ডাকবে? তারা শেষরাতে জেগে কান্নাকাটি করবে? তারা কী করবে? আর যখন তাদের সামনে কোনো বড় সমস্যা দেখা দেয়, তখন তাদের জন্য আত্মহত্যা ব্যতীত কোনো পথ থাকে না। তারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করল, কিন্তু আখিরাতে কী করবে? কুরআনে বলা হচ্ছে-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا.

'তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না, তারা মৃত্যুবরণ করবে। আবার তাদের শাস্তিও লঘু করা হবে না।' [সুরা ফাতির: ৩৬]

আত্মহত্যা করলে হয়ত সে পার্থিব কষ্ট থেকে রেহাই পাবে, আখিরাতে তো তা হবে না। সে দিন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করে দেওয়া হবে। আর বলা হবে- হে জান্নাতবাসী!

চিরদিন জান্নাতে থাক, আর কোনো মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন জাহান্নামে থাক, তোমাদেরও আর কোনো মৃত্যু নেই। আর এ কারণেই তারা এই আকাঙ্খা করে যে, আমাদের জন্য মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হোক......

আর তারা বলবে-

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.

'হে মালেক, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালক মৃত্যুর আদেশ দিক।' [সুরা যুখরুফ: ৭৭]

আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, এক হাজার বছর পর মালেক ফেরেশতা তার কথার জবাব দেবে। কত বছর? এক হাজার বছর!!

জাহান্নামবাসী ছয়বার সাহায্য চাইবে। তারা বলবে-

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ.

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে আপনি প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার প্রাণ দিয়েছেন। আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। এখন নিস্কৃতির কোনো পথ হবে কি? [সুরা মুমিন: ১১]

তাদের এ প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে এক হাজার বছর কেটে যাবে। তারপর উত্তর আসবে-

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.

'তোমাদের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরিক স্থাপন করা হলে,

তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত: সমুচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।' [সুরা মুমিন: ১২]

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ.

'জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করেন!' [সুরা গাফির- ৪৯]

শুধুমাত্র একদিনের শাস্তি কমাবে। তার উত্তর আসতে এক হাজার বছর চলে যাবে। দীর্ঘদিন পর উত্তর আসবে-

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

'ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ রাসুলগণ আসে নি? জাহান্নামিরা বলবে, অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।' [সুরা গাফির- ৫০]

তারা সর্বশেষ প্রার্থনা করবে-

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.

'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।' [সুরা মুমিনিন: ১০৬-১০৭]

হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরি করি; তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হব!!.

এভাবেই শেষ হবে তাদের আবেদনের পর্ব। এবার জাহান্নামবাসী নিরাশ হয়ে যাবে। তারা ক্রন্দন করতে শুরু করবে, তাদের অশ্রুতে চোখ ভেসে

যাবে। পানি শেষ হয়ে যাবে, চোখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। যদি তাতে কোনো নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া হত, তবে চলতে পারত।

আল্লাহর কসম, কাফের, ফাজেরের মুসিবত পৃথিবীতে এবং আখিরাতে প্রকৃতই মুসিবত হবে। আমাদের কারো যখন মুসিবত আসে, সে মুমিন রাতে দাঁড়িয়ে যায়, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে শুরু করে- হে আমাদের প্রতিপালক, এই বিপদের বাধা খুলে আমাদের থেকে খুলে দিন, আল্লাহ সহজ করে দিন, দয়া করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতিটি পেরেশানিতে আপনি প্রশস্তি দিন, তা খুলে দিন, প্রতিটি সঙ্কীর্ণতা থেকে উত্তরণের উপায় দিয়ে দিন!

এভাবেই তো আপনি আপনার প্রতিপালককে ডেকে থাকেন। আর আমেরিকা এবং ইংরেজরা কোথায় যাবে? আর এ কারণেই মুশকিল বিপদ একের পর এক চাপতেই থাকে এমনকি এভাবে বন্ধন এবং ধ্বংস অপদস্থতা রচিত হতেই থাকে। কুরআনে বলা হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যখন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।' [সুরা মুজাদালাহ: ৫]

ধ্বংস, অপদস্থতা তাদের পথ ছাড়ে না। আর তাই তো আপনি কোনো বিষয়ের প্রতি তাদেরকে নরম হতে দেখবেন না। চলছে, খাচ্ছে, উপভোগ করছে; কিন্তু তারা জানে না, এসব কষ্ট দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচার উপায় কী, যা মাথায় নিয়ে তারা বসবাস করছে! আর তাই তারা মদ এবং নিশার জিনিস ছাড় কিছুই খুঁজে পায় না। তাদের জন্য কোথাও শান্তি নেই!

এসব নেশা ও হিরোইন যা কিনা আমেরিকান যুবসমাজ ব্যবহার করে, এই হিরোইনের প্রতি গ্রাম এক হাজার ডলার। প্রতি কিলো এক মিলিয়ন ডলার। তাদের সঙ্গে আপনি সর্বক্ষণ ইঞ্জেকশান পাবেন। নেশার ইঞ্জেকশান। এ

অঞ্চলের পুরোটাই নীল হয়ে গিয়েছে অতিমাত্রায় এসব ইঞ্জেকশান ব্যবহারের কারণে। যখন এসব হিরোইন, কোকেইন, এলকোহল পেতে দেরি হয়, তারা পাগলপ্রায় হয়ে পড়ে। একটি দিন তারা সহ্য করতে পারে না, ধৈর্য ধরতে পারে না। মূলত তারা এসব হিরোইন, কোকেইন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। ঘুমাতে পারে না, কষ্ট, অস্থিরতা, চিন্তা-পেরেশানি তাদেরকে চেপে ধরে। আর তাই, আপনি দেখবেন আমেরিকার ৫৪ মিলিয়ন মানুষ নানা ধরনের আত্মিক, মানসিক এবং স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত। তাদের সমাজে এক চতুর্থাংশের সামাজিক বন্ধন নেই। হয়ত মহিলার পক্ষ থেকে তাকে ত্যাগ করেছে, সন্তান তাকে ত্যাগ করেছে, মদে ডুবে গিয়েছে। কোনো কল্যাণের কাজে নয়। অবশেষে সে তার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘোষণা দেয়। আপনি একেকজনকে দেখবেন, মিলিয়নপতি। পত্রিকাগুলো লিখছে অমুক আত্মহত্যা করেছে। অথবা নিজেকে ট্রেনের সামনে ঢেলে দিয়েছে। ট্রেনের চাকার নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অথবা কোনো উঁচু ভবন থেকে লাফিয়ে পড়েছে নিজের চিন্তাপেরেশানি থেকে মুক্তি পেতে। সে পালানোর কোনো পথ ও রাস্তা সামনে খোলা পায় নি, নিস্তারের কোনো রাস্তা তার নেই, সে এখন কোথায় যাবে? আল্লাহ ছাড়া আশ্রয়ের তার কোনো জায়গা নেই।

আল্লাহর কসম মুক্তির সনদ তারা তাদের দফতর, দেওয়ান থেকে মুছে দিয়েছে, তাদের অভিধানগুলোতে এমন কোনো শব্দও অবশিষ্ট নেই।

আর তাই এবার তারা পথ খুঁজে ফিরছে, কিন্তু ইসলাম ছাড়া তো তাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। আর তাই আপনি লক্ষ করে দেখবেন, বিগত বছরগুলোতে ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন রোজিয়া জারুদি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একজন দার্শনিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ফিলিস্তিনে একবার আমাকে আমার এক মুজাহিদ ভাই বলল, আমি এবং একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এক ব্যক্তি তিনদিনের জন্য আটক হলাম। অথবা আরও বেশ কয়েকদিন হতে পারে, ইহুদিরা আমাদেরকে আটক করল। সে আমাকে অবশেষে বলল- যখন আমরা পানি এবং খাবারের

ঘাটতির কারণে মৃত্যুর উপত্যকায় গিয়ে উপনিত হলাম। সে আমাকে বলল, তুমি তোমার প্রতিপালককে ডাক। আমি বললাম, তুমি বরং স্টালিনকে ডাক, সে যেন আমাদেরকে এ থেকে মুক্ত করে। এ মুসলিম তাকে বলছে- স্টালিনকে ডাক, কার্লমার্কসকে ডাক। সে তাকে বলল, কোথায় মার্কস আর কোথায় স্টালিন? আমি বললাম- হে আল্লাহ, সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন।

আমি আপনাকে বলতে চাই, রাশিয়ার এসব সমাজতন্ত্রবাদীরা যারা কিনা জিতরালে এসেছে, তাদের প্লেনে চড়ে। তোমাদেরকে কোন বিষয়টি বেশি ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে? তারা বলল, স্ট্যানজারের আওয়াজ। তবে আমাদেরকে তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে কিছু কথা শিখিয়ে দিয়েছে আফগান মিত্ররা। আমরা সেগুলো পাঠ করি, যা আমাদেরকে সে আওয়াজ থেকে রক্ষা করে! তারা কুরআন পড়ে, যা তাদেরকে রক্ষা করে। তাদেরকে কি মার্কস এবং স্টালিন, গর্ভাচেভ রক্ষা করে এসব আওয়াজ থেকে?

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

'তারা যখন জাহাজে আরোহন করে, তখন তারা নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহকে ডাকে। যদি তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

তার প্রকৃতিই তাকে প্ররোচিত করে।

আমার প্রিয় ভাই! আমি বলব, আমাদের নিটক আমাদের ইসলামের দেওয়া হালাল এবং হারামের অস্তিত্ব আছে। হালালের ভিত্তি আছে, আছে হারামেরও ভিত্তি। কিছু জিনিসকে আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ কাজটি কর আর অমুকটি কর না।

সাহাবায়ে কিরাম আমাদেরকে নবিজি থেকে বর্ণনা করে জানিয়েছেন, নবিজি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, যদি তোমরা এ কাজ কর, তবে তোমরা দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় জগতে দুর্বল হবে। যদি তোমরা তা

ত্যাগ কর, তবে আরাম পাবে, শান্তি পাবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। সুদ খেও না। তোমরা একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর না। আমাদের ইসলামে আমাদের ধর্মে হালালের সীমারেখা এবং হারামের সীমারেখা পরিচিত, প্রসিদ্ধ। আচ্ছা বল তো- ইউরোপ, আমেরিকায় হালাল এবং হারামের সীমারেখা কী? হালাল কী আর হারাম কী? তারা নিজেরাই যা মন চায় হালাল করে নেয়, যা ইচ্ছা হারাম করে নেয়! তারা বলে- আমরা যিনা-ব্যভিচারের বৈধতা চাই, তোমরা তোমাদের হাত তোল, যারা এব্যাপারে একমত! দেখা গেল তাদের ৫০% জনগণের কাছে যিনা-ব্যভিচার বৈধ! তারা বলল- আমরা সমকামিতার বৈধতা চাই। যারা এর সঙ্গে একমত তারা আঙুল উঁচু করুন। ৫০% চেয়ে অধিক মানুষের কাছে তা হালাল এবং বৈধ। আমরা সুদকে হালাল করতে চাই, যারা একমত হাত তুলুন। ৫০% চেয়েও বেশি জনগণের কাছে তা হালাল। এভাবেই তারা সবকিছু নিজেদের মত সবকিছু বৈধ বা অবৈধ করে নেয়।

কিন্তু আমাদের বিষয়টি আমাদের রব-প্রতিপালক, যিনি আমাদের জন্য এই স্পষ্ট নুর, মুমিনের জন্য উপকারী এবং প্রতিষেধকরূপে অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনে ঘোষণা করছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উপদেশ এসেছে, নসিহত এসেছে। আর অন্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, তার প্রতিষেধকও বটে।' [সুরা ইউনুস- ৫৭]

সে ব্যাধি হচ্ছে- চিন্তাপেরেশানি, অস্থিরতা ইত্যাদি। আর তাই তো, যখন কারো কোনো প্রকার চিন্তা পেরেশানি অনুভব হয়, সে দুআ করতে শুরু করে-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ بْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা;' তোমার বান্দার ছেলে, তোমার উম্মতের সন্তান, আমার ভাগ্যলিপি তোমার হাতে, তোমার আদেশেই তা চলমান। তোমার বিচারেই ন্যায়পরায়ণতা। তুমি তোমার যেসব নাম দিয়ে নিজের নামকরণ করেছ, তোমার কিতাবে যা কিছু অবতীর্ণ করেছ, তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ, তোমার পক্ষ থেকে তোমার গায়েবের ইলমে যাকে প্রাধান্য দিয়েছ তার বদৌলতে বলছি- তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তে পরিণত কর। আমার অন্তরের নুর বানিয়ে দাও। আমার পেরেশানির উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, আমার চিন্তাপেরেশানি দূর হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দাও!'

দেখা যায় যে, আল্লাহ তার সমস্ত চিন্তাপেরেশানি দূর করে দিচ্ছেন, তদস্থলে অন্তরের খুশি আর আনন্দে ভরপুর করে দিচ্ছেন।

কুরআন মানুষের অন্তরকে স্বচ্ছতা দান করে, অন্তর ও শরীরের সব রোগের প্রতিষেধক। আমাদের জন্য হেদায়েত, দয়া, রুহ এবং নুর। আপনি এরচেয়ে বেশি কিছু আপনি কী চান? দেখুন তো, আমেরিকা এসব কোথায় পাবে? ইহুদি, অবাধ্য, গুনাহে জর্জরিত, নাফরমানসমাজ চাই তারা মুসলিমসমাজে হোক বা অমুসলিমসমাজে, তারা এসবের প্রতিষেধক কোথায় পাবে? এসবকি রিগ্যান, জিসরান বা কিবতানের কাছে পাওয়া যাবে? না এসব কি তন্দ্রালু ব্যক্তি বা ক্ষুধার্তের কাছে পাওয়া যাবে? তারা এসব কোথায় পাবে? কোথায়?

সুতরাং আমরা এক বিশাল নিয়ামতের অধিকারী। কেউ লালিত-পালিত হচ্ছে, যে কিনা এখনো ছোট। কুদৃষ্টি হারাম, সে তার সারাটি জীবন জানে যে, কুদৃষ্টি হারাম, পরনারীর সঙ্গে নির্জনতা হারাম, ব্যভিচার হারাম, ব্যস এতটুকুই যে, তা হারাম! সুদ হারাম, গিবত হারাম। সুতরাং তার বক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে বেড়ে উঠছে, তার প্রতিপালকের নির্দেশে; কিন্তু

আমেরিকা সে কী করে? তার জনগণ এর কী করতে পারে? একদিন মদ হালাল আরেকদিন হারাম। রাষ্ট্র একবার মদকে হারাম ঘোষণা করে আবার তাকে বৈধতা দেয়। কোনো সময় হয়ত কাউকে শাস্তি দিচ্ছে, কখনো দিচ্ছে না।

মদ ইসলামে হারাম। একটি মুসলিম শিশু তার দুবছর বয়সেই জেনে নেয় যে, মদ হারাম, তা পান করা দোষণীয়। প্রতিটি হারাম কাজই ইসলামে দোষের। আর প্রতিটি বৈধ বিষয়ে কোনো দোষ নেই, কোনো গুনাহ নেই। আর এ কারণেই হাদিসে এসেছে, যখন বিষয়টি শরিয়তের কোনো কাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হবে, তখন তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার। অথবা বলা যেতে পারে, বেশরম যা খুশি তাই করতে পারে। কার্যত আমরা শান্তিতে আছি। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা শুধু পথটুকুই জেনে নেব। ইউরোপের জন্য এমন মসৃণ রাস্তা এবং পথ কোথায়? তারা কোথায় যাবে? আমাদের নিয়মকানুন আদর্শ সবকিছুই মুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাগতভাবে এবং বাস্তবিকদিক থেকেও।

আমরা আমাদের পথ চিনি। আমাদের শুরু, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের পরিসমাপ্তি সবই। এমনকি এও জানি, আমরা কোথা থেকে এসেছি! আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের শেষ কোথায় হবে? কুরআনে বলা হচ্ছে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন। এরপর তোমাদেরকে তিনি কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদেরকে তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন? একমাত্র ইবাদত করার জন্য। এই পৃথিবী আসমান-জমিনের দায়িত্বশীল কে? আল্লাহ হচ্ছেন আসমান-জমিন সবকিছুর মালিক। যে উপাস্যের আমরা ইবাদত করে থাকি। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, প্রজ্ঞাবান, দয়ালু, তিনি তার বান্দাদের ব্যাপারে কোমল!

অন্যদিকে ইউরোপের কী আছে? তারা কার সঙ্গে লেনদেন করবে? তারা কার কাছে আশ্রয় নিবে? তারা কোন সুরক্ষিত কেল্লায় গিয়ে লুকাবে? তারা কিসের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করবে? শয়তান, জিন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহ, আখিরাত, পরকাল এসব শব্দ পশ্চিমাদের অভিধান থেকে মুছে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। চেক আর ডলার ছাড়া সেখানে কিছু নেই। মার্কের দাম কত?

দিনারের দাম কত? ডলারের দাম কত? এইতো তাদের জীবন। আর এ কারণেই মানুষ সেখানে কোনোপ্রকার দায়বদ্ধতা ছাড়াই, কোনোপ্রকার জবাবদিহিতা ছাড়াই জীবন যাপন করছে, যতটুকু পারছে, অত্যাচার করছে। যেখানে পারছে, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করছে। যখন পারছে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, পারছে তো চুরি করছে! কোনো বাঁধাবিপত্তি নেই, কোনো পরোয়া নেই। কেউ কারো কোনো পরোয়া করে না।

কৃষ্ণবর্ণ আমেরিকায় একটি পরিচিত বিষয়। তারা অনেক কষ্ট করে। আমাদের এক ভাই সে প্রাদেশিক গভর্নরের পাশেই বসবাস করে। সে দেখল, আমেরিকান কৃষ্ণবর্ণ আমাদের এক মুসলিম ভাইয়ের ওপর সন্দেহ করছে। সে তাকে বলল, এই কালো সে এখানে প্রবেশ করবে না। সে বলল, কেন? সে তাকে বলল, কারণ সে অপরাধী, চুরি করে, হত্যা করে। সে বলল, সে চুরি করে না। সে বলল, চুরি করে। সে তাকে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরীক্ষা করে দেখব, কে চুরি করে! আজ আমরা একশত ডলার রেখে দেব, সে যখন আমাদের কাছে প্রবেশ করবে। তারা একশ ডলার ঘরের ভেতর রেখে দিল। সে ঘরের ভেতর ঢুকল, একশত ডলার পেয়েই সে তা নিয়ে নিল। সে যখন প্রবেশ করল, বলল, আমি একশত ডলার পেয়েছি। মনে হয় বাড়ির মালিকের হবে। আর সে তাকে বলল, কাল তোমার ছেলেকে পরীক্ষা করে দেখব। সেই একশত ডলারই রেখে দেওয়া হল। গভর্নরের ছেলে ঘরে ঢুকল এবং তা পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার সে বলল, আচ্ছা এবার বলুন, কে চুরি করে কালো বর্ণের লোকটি নাকি তোমার ছেলে? সে তাকে বলল, এই কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে মুসলিম। ইসলামে চুরি হারাম করা হয়েছে। আর এ কারণে সেখানে কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। ইসলাম ব্যতীত কোনো সমাধান কখনো পাওয়াও যাবে না। তারা বলে, কানুন তৈরি করতে হবে। আইন কি চুরি বন্ধ করতে পারে? অত্যাচার বন্ধ করতে পারে? যিনাব্যভিচার বন্ধ করতে পারে? কখনোই তা পারে না। আর তাই সমাজ এভাবে ধ্বংসনুখ হয়েই থাকবে...

আর তাই তো আমাদের আরবের সমাজ বলে, ১৯৪৯ সালে আরবের সবদেশই খিয়ানত করেছে, তারা ফিলিস্তিনকে সোপর্দ করেছে। সুতরাং তাদেরকে পদস্খলন ঘটাতে হবে। সম্পদ এবং সম্পদশালীরা এ ব্যাপারে

এগিয়ে এল যে, বাদশা ফারুক, বাদশা আবদুল্লাহ, অমুক বাদশা এবং অন্যান্যরা, তারা সবাই খিয়ানতকারী, তারা ফিলিস্তিনকে সোপর্দ করেছে, ইহুদিদের হাতে তুলে দিয়েছে! ধনবানরা জাতিগোষ্ঠীর অর্জন এবং ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করতে এল, তবে কী অর্জন করতে পারল? আমাদের এখানে মিশরে একজন বাদশা, একজন হাকেম বিচারক ছিল, এখন আমাদের হাজারও প্রশাসক হয়ে গিয়েছে। তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে চুরি করে। ফারুক শাসক ছিল, সে তখন একাই চুরি করত। আজ সব ধনবানই বলদ, যাদের লম্বা শিং রয়েছে, সবাই চুরি করে। প্রাচুর্যের ফল তো এই ছিল যে, সতের হাজার মিলিয়ন উৎপাদন হত। ফারুক মিশরের সঙ্গে গাদ্দারি করল আর মিশর সে তো সারা বিশ্বের জন্যই মহাজন ছিল। সৌদি সেখান থেকে ঋণ নিত। আরব দেশগুলো সেখান থেকে ঋণ নিত। বৃটেন সেখান থেকে ঋণ নিত। আর এখন কোথায়? আজ মিশর তার ঘাড়ে চেপে বসা সুদের বোঝা সরাতে পারছে না। তার কমের পরিমাণও তিনশত ছয় হাজার মিলিয়ন ডলার হবে!! এর সবই জাতিগোষ্ঠীর জন্য। অস্ত্র কেনার জন্য। দুবার তারা অস্ত্র ক্রয় করে এবং ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৬৭ সালে তা ইসরাইলকে প্রদান করে। সব অস্ত্রই মিশরি জনগোষ্ঠীর রক্তের বিনিময়ে কেনা অথচ তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। তারা সানার দিকে অগ্রসর হল, সেখানে সৈন্যবাহিনীকে ফেলে রেখে আসল আর ইসরাইল তা লাভজনক শীতল গনিমত হিসেবে তুলে নিল।

আর এ কারণে কিছু মানুষ বলে, ভাই, রাজনীতি নিয়ে কেন কথা বল? এসব কেন? আমরা দীনের মধ্যে আছি, নাকি রাজনীতিতে?

ইসলামের পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে বিচার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে। একজন হাকেম বা শাসকই ইসলামের সবকিছু নাশ করতে পারে। বিষয়টি কি এমনই নয়? হাকেম তো একজন। হুকুমদাতা তো একজন। তুমি কি তোমার প্রতিপালককে ইবাদত করতে পারবে? প্রাচুর্যের এই দেশে তুমি কি তোমার দাড়ি রাখতে পারবে? তার বিপ্লব তো উপচে পড়ছে। কারো কাছে তো মহাবিপ্লবী বীর সাদ্দাম অথবা কাযাফি অথবা হাফেজ আসাদ। তোমার স্ত্রীকে সেখানে শরঈ পোষাক পরাতে পারবে? তাহলে বোঝা গেল, রাজনীতি দীনের জন্য প্রয়োজন। নামায এবং রোযার আয়াত হচ্ছে বিরাশিটি। কিন্তু শাস্তির

আয়াত, আদেশমূলক আয়াত, আর্থনৈতিক আয়াত এবং রাজনীতি ইত্যাদির আয়াত। কিন্তু নামায রোযার আয়াতের চেয়ে অনেক বেশি। আর এ কারণে যারা জেলখানায় খালেদ ইসলামবোলির হয়ে প্রতিহত করেছে বিচারালয়ে, তারা বলেছে- খালেদ ইসলামবোলি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে সাদাতের ওপর! কেন? কেন তারা এ কথা বলেছেন? তারা বলেন, সাদাত কাফের; কেন? তারা বলেন- কারণ সাদাত বলেছে, রাজনীতিতে কোনো দীনের অংশ নেই, দীনের ভেতরও কোনো রাজনীতি নেই। এতো কুফর। কারণ রাজনীতি অত্যাবশ্যকভাবে দীনের অংশ। সে দীনের এমন কিছু বিষয়কে অস্বীকার করেছে, অত্যাবশ্যকীয়ভাবে যা দীনের অংশ। সুতরাং সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই তার রক্ত হালাল। তাকে হত্যা করা আবশ্যক। তাই যে বলবে দীনের মধ্যে রাজনীতি নেই অথবা রাজনীতিতে দীন নেই, সে দীন থেকে বহিস্কৃত। যদি সে এ বিষয়টি জানে। কারণ ইসলাম হচ্ছে কার্যকরী বিষয়ের নাম, তা কোনো সাদৃশ্যের নাম নয়। যেমন দিরহাম-দিনার। যার একপিঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ লিখা, অন্যপিঠে বলা হয়েছে- বিচার ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশের মাধ্যমেই হবে। এর এপিঠ অন্যপিঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

'শাসন একমাত্র আল্লাহর, তিনি আদেশ করেছেন, তোমরা তারই ইবাদত কর, আর তা-ই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দীন।' [সুরা ইউসুফ: ৪০]

একথাটি ঠিক। আর তাই সমস্ত উম্মত এতে একমত যে, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত কিছু বিধিবদ্ধ করে, যদিও তা আইন করেই হোক না কেন, তবে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত, মুরতাদ। তাহলে বলো তোমরা কোথায় আছ? তোমরা বলছ দীনের মধ্যে রাজনীতি নেই? তবে দীন কোন জিনিসের নাম? শুধু নামায আর রোযা? আল্লাহ কুরআনে বলেন-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

তারা বৈরাগ্যকে আবিস্কার করে নিয়েছে, যা আমি তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিনি। [সুরা হাদিদঃ ২৭]

দীন তো জিহাদের নাম। দীন তো রাজনীতির নাম। দীন তো শাসনব্যবস্থার নাম। দীন তো ডাকাত, রষ্ট্রদ্রোহী, ব্যভিচারী, চোরদের ওপর শাস্তির বিধান, দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করার নাম। এসবই হচ্ছে দীন। আর আল্লাহর দণ্ডবিধির কোনো দণ্ড প্রতিষ্ঠা করা মানুষ চল্লিশটি সকাল বৃষ্টির ন্যায় দান করার চেয়েও উত্তম।

রাসুল ﷺ বলেছেন-

'আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত, তবেও মুহাম্মদ তার হাত কেটে দিত! নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, যদি কোনে দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তবে তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত।'

এতে বোঝা গেল, সবার জন্য দণ্ডবিধি সমানভাবে প্রয়োগ না করা উম্মতের জন্য ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ তায়ালা যে বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন, তাকে বাস্তবায়ন করার দ্বারা উম্মত ধ্বংস এবং পদস্খলন থেকে রেহাই পাবে। নতুবা তোমাদের ওপর শত্রুবাহিনীকে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

হে মুহাজিরগণ, পাঁচটি বিষয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। আমি সে পরীক্ষা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১. যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে, তখন তাদের মধ্যে ক্ষুধামন্দা দেখা দেবে, যা কিনা বিগত কয়েক শতাব্দিতেও প্রকাশ পায়নি, তা এই মাত্র অল্প কয়েকদিনে দেখা যাচ্ছে ব্যভিচারের দ্বারা এইডস রোগ ছড়াচ্ছে।

২. যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আসমান তার বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ করে দেবে। যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে কোনো বৃষ্টিই হত না।

[এই অস্বীকৃতি দুভাবে হতে পারে, হয়ত মানুষ মুখেই অস্বীকার করবে, যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যাকাতকে টেক্স, জরিমানা ইত্যাদি হিসেবে অবিহিত করা হচ্ছে। অথবা মুখে তো অস্বীকার করবে না, তবে যাকাত ওয়াজিব ও ফরজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তা আদায় করবে না। অনুবাদক]

৩. কোনো সম্প্রদায় যখন ওজন পরিমাপে কম দেবে, তখন বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। উপায়উপকরণের ঘাটতি দেখা দেবে, রুটিরুজি কমে যাবে। যে মিশরকে রোমের খাবারে ভরপুর দেশ মনে করা হত। রোম সাম্রাজ্যের গমের রাজভাণ্ডার মনে করা হত। যে মিশর সম্পর্কে আমর ইবনুল আস বলেছিলেন- যখন আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং উমর তার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন, আমি হাজির হে আমিরুল মুমিনিন। আমি আপনার কাছে এমন এক কাফেলা পাঠাব, যার অগ্রভাগ মদিনায় থাকবে এবং তার শেষাংশ থাকবে মিশরে! আজ মিশরের সে গমশস্য কোথায়? বর্তমানে মিশর আমেরিকার গমের শিপের অপেক্ষায় থাকে মাসের পর মাস। যখন আমেরিকা সেখানে কোনো আন্দোলন তৈরি করতে চায়, তখন শিপ পাঠাতে মাস খানেক দেরি করে।

৪. আর যখন উম্মতের ইমামগণ আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমল ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তাদের মাঝে কঠিন সঙ্কট সৃষ্টি করে দেবেন।

৫. যখন কোনা সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেবেন, তারা তাদের কাছে থাকা সম্পদের কিছু অংশ নিয়ে নেবে।

আর বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আমাদের ওপর আমাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা আমাদের অধিকারে থাকা সবকিছু দখল করে

নিচ্ছে। হায়, আফসোস! যে জীবন আমরা যাপন করছি, এ তো লাঞ্ছনার জীবন, অপদস্ততার জীবন! কী পরিতাপের বিষয়!

তবে আফগানের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে আমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। আফগানকেও আল্লাহ ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আরবি জাহাজ আমেরিকান জাহাজকে অবলম্বন করে নিয়েছে, তার পাশে পাশে চলে এমনকি তাকে সংরক্ষণ করে। আমেরিকান জাহাজ না হলে সাগরে আরবি জাহাজ চলতে পারে না। তার ওপর আমেরিকান পতাকা উড়িয়ে দেওয়া আছে!

কবি বলেন-

ذل من يغبط الذليل بعيش * رب عيش أخف منه حمام

লাঞ্ছনা তো তা-ই যে, কোনো ব্যক্তি যখন লাঞ্ছিত ব্যক্তির জীবনকে নিয়ে ঈর্ষা করে।

অনেক জীবন এমন আছে, যা কবুতরের জীবন অপেক্ষা হালকা।

এমন তো জীবন আছে, যার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। কেন? আমাদের ওপর আমাদের শত্রুকে চাপিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরকে জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে অপদস্থ করেছেন।

মানুষ যখন টাকাপয়সা (দান করার ব্যাপারে) কার্পণ্য করবে এবং ঈনা বেচাকেনা করবে, সুদ অথবা সুদের বাহানা ধরবে, চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, গরুমহিষের লেজ আঁকড়ে থাকবে এবং এসব চতুস্পদ জন্তুর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে, জিহাদকে ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাদের ওপর লাঞ্ছনা অপদস্থতা চাপিয়ে দেবেন, যদি না তারা তাদের দীনের দিকে অর্থাৎ জিহাদের দিকে ফিরে আসবে।

মনে হচ্ছে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দীন ছেড়ে দেওয়া, দীন থেকে বহিস্কৃত হওয়া। খামিনি কি একটি বিপদ ও জটিলতা? খামিনি যে কিনা স্পষ্ট

বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, আর আপনারা সবাই তার ভয়ে কেঁপে উঠছেন? বলুন তো আপনাদের হল কী? কী হয়েছে? আপনারা রাসুলের ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম নন? তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হকদার নন? যেমনটা ড. ইকবাল বলেন-

إنما الإسلام في الصحراء امتهد * ليخرج كل مسلم أسد

ইসলাম তো বিরানভূমিতে লালিত পালিত হয়েছে
যেন সে প্রতিটি মুসলিমকে একটি সিংহরূপে গড়ে তুলতে পারে।

আপনারা যদি সবাই আলি, মিকদাদ, হামযা, মুসআব, কাকা ইবনে আমরের সন্তান হতে না পারেন, তবে নীল মাছি আনতারার সন্তান হয়ে যান। কবি বলেন-

لا تسقني كأس الحياة بذلة * بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

জীবনের শরাব তুমি আমাকে লাঞ্চনার সঙ্গে পান করিও না
আমাকে বরং হানযাল ফলের মর্যাদার শরাবের পেয়ালা দাও।

আজ তোমাদের কী হল! সর্বত্রে শুধু তোমাদের সাংবাদিকেরা ঘুরে ফিরছে। যখন তাদের ওখান থেকে কেউ কোনোরকম পালিয়ে আসে, রিপোর্ট লিখতে শুরু করে, সে কোথায় গিয়েছে? আফগানে গিয়েছে। সে সেখানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে চায়, তোমাদের কর্মচারীরা কোথায় গিয়েছে? কোথায় তোমাদের সৈন্যসামন্ত? তারা আজ কোন কাজে ব্যস্ত? তোমরা তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাঠানোর পরিবর্তে, প্রশিক্ষণ নিচ্ছ, সম্মান-মর্যাদার চর্চা করছ আর সুযোগে এই ছেলেটির সঙ্গে মিলিত হচ্ছ, যে কিনা তার পরিবার, সমাজ, স্কুল থেকে পালিয়ে হাজার মাইল রাস্তা পারি দিয়ে এসে পৌছেছে। আর তোমরা তোমাদের সাংবাদিকদেরকে পাঠাচ্ছ একটি রিপোর্ট নেওয়ার জন্য!

সাংবাদিকেরা ছদা বা ডেরা গাজিতে পৌছুল, একটি রিপোর্ট লিখল সে ব্যাপারে, কেন? এটি তোমাদের জন্য নিরাপদ। দুনিয়া এবং আখিরাতে উভয় জায়গাতেই মর্যাদা। তবে কেন তোমাদের প্রতিটি যুবককে আফগানে পাঠাও না, যেন তারা ব্যাংকক আর আমেরিকায় বসে মরার চেয়ে এখানে বীর পুরুষ হয়ে মরতে পারে? কেন? তোমার মা অসুস্থ, দাদী মৃত্যুবরণ করেছে। খালা মরে গেছে। এভাবে.....! এসব কী? আর এ কারণেই তো অনেকে খামিনির সামনে ভয়ে থরথর করে কাঁপছ, ভীতসন্ত্রস্ত হচ্ছ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন, নতুবা তোমরা তোমাদের যুবকদের পথ উন্মুক্ত করে দাও, তারাই তোমাদেরকে সংরক্ষণ করবে খামিনি কিংবা খামিনি ছাড়া আরও যারা আছে তাদের থেকে। তোমরা ভেবেছ যেসব সৈন্যরা গোশত আর ভাত খাচ্ছে। যাদের দায়িত্ব শুধু কাঁধের ব্যাজকে ঔজ্জ্বল্য দিতে ব্যস্ত এবং শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে পরিকল্পনা করে, তারাই খামিনির বাহিনীর সামনে দাঁড়াবে?

খামিনি যখন এই যুদ্ধের জন্য আহবান করবে যে, আমি এক লক্ষ যুবক চাই, তার সামনে আধা মিলিয়ন ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমরা আমেরিকাকে আহবান করবে, তোমাদেরকে রক্ষা করবে আমেরিকা? আমেরিকা, মেয়েলী সন্তানেরা, ধ্বংসশীল সন্তানেরা রক্ষা করবে ইসলামের সন্তানদেরকে? তোমাদের কাছে কোনো পুরুষ নেই? যদি তোমাদের কাছে কোনো পুরুষ থাকে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও আফগানে আসার জন্য, তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তোমাদেরকে হেফাজত করবে। আল্লাহর কসম! তোমরা তাদের জন্য আফগানের পথ ছেড়ে দাও, আমেরিকা তোমাদের ভূমিতে আসার পরিবর্তে তোমাদের পেট্রোল এবং তেলের খনিগুলোর ওপর আমেরিকা হস্তক্ষেপ করার চেয়ে তোমাদের জন্য এক লক্ষ যুবক নাও, যারা তোমাদেরকে খামিনি থেকে রক্ষা করবে। এখানে আমেরিকা আর খামিনির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? কে বেশি খারাপ? এই খামিনি তো কমপক্ষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়। আর আমেরিকা বলে, আল্লাহ হচ্ছে তিনের এক। এতো আগুন দিয়ে সূর্যের উত্তাপ ধার নেওয়ার মত!! কেন?

ليس من مات فاستراح بميت * إنما الميت ميت الأحياء

যে মরে গেছে সে তো মরে নি, আরাম করছে,
মৃত তো সেই, যে এখনো বেঁচে আছে!

হাদিসে নবিজি বলেছেন, 'সমস্ত জাতিগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে, যেমনিভাবে প্রস্তুতকৃত খাবারের পাত্রের দিকে মানুষ একে অপরকে আহবান করে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেদিন আমরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে এমন হবে? নবিজি বললেন, না, তোমরা সেদিন সংখ্যায় বেশি হবে; তবে স্রোতে ভাসমান খড়কুটোর ন্যায় হবে। তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ওহান ঢেলে দেবেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওহান কী জিনিস? নবিজি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, মৃত্যুর প্রতি অনীহা।'

ইরানের অধিবাসীদের দিকে তাকান, খামিনি সে তার বিভ্রান্তি দিয়ে একটি দলকে পরিচালিত করছে। অথচ সে নিজেই ভ্রান্ত! আজ আপনি তেহরানের রাস্তা-ঘাট, তার বাড়িগুলোতে গিয়ে দেখুন, প্রতিটি মহিলারা ঘরে চকলেট, কেক এবং মিষ্টান্ন তৈরি করছে মুজাহিদদের জন্য [তাদের দৃষ্টিতে যারা জাবহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তারা মুজাহিদ।] সকালে প্রতিটি ঘরে ঘরে গাড়ি যায় এবং কেকগুলো একত্রিত করে নিয়ে আসে, কাপড় নিয়ে আসে, যা কিনা মহিলারা মুজাহিদদের জন্য বুনেছে, যেন তারা শীত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। পুরো একটি জাতি এ কাজে ব্যতিব্যস্ত। একটি জাতির এটি একটি বিশ্বাস, যদিও তারা ভ্রান্ত কিংবা বাতিল। তাদের নিকট একটি নেতৃত্ব আছে, আছে একটি জাতিগোষ্ঠী।

আর আমাদের কাছে কী রয়েছে? আমাদের কাছে রয়েছে ফুটবল। কেউ এশিয়া কাপ নিয়েছে, কেউ পেয়েছে বিশ্বকাপ? আমরা ধরে আছি, কার সন্তান কয়টি স্বর্ণ মেডেল পেল! এসবে কার সন্তান কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পারল!

আমেরিকান প্রশিক্ষক তার পারিশ্রমিক চাচ্ছে এক মাসে তিনশত পাঁচ ডলার। এরপর একদল যখন ওপর দলের ওপর বিজয় লাভ করবে, অমুক রানি

আসবে অমুক প্রদেশে, মিলিয়ন দিরহাম অনুদান দেবে তাকে, অর্ধ মিলিয়ন তার স্ত্রীকে। সঙ্গে রয়েছে স্বর্ণরূপার আরও নানা উপহার-উপঢৌকন। আর আফগান তখন সমাবেশ জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করতে যাবে। আর এতে করে কোনো সমাধান আর হবে না। কোনো সমাধান হবে না ইসলাম ছাড়া, ইসলাম ছাড়া কোনো সমাধান নেই। আল্লাহর কসম! আমি যদি তাদের স্থলে হতাম– আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিন– আমি এসব যুবকদের জায়গায় হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় হলে, আমি এ বছরের জন্য বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দিতাম। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ মওকুফ করে দিতাম এবং তাদেরকে বলতাম- তোমরা সবাই আফগানে চলে যাও, যাও এবং ঘুরে এসো। দেখো, সেখানে কী ঘটছে? ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার, অমুক মেকানিক, এসব নামে আমাদের কী লাভ? এসব সার্টিফিকেটে আমাদের কী লাভ আর উপকার বয়ে আনছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সার্টিফিকেটের চেয়ে আফগানের একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে সারা বিশ্ব অধিক ভয় করছে, বিষয়টি কি এমনই নয়? আহমাদ শাহ্ মাসউদ, তার কী সার্টিফিকেট রয়েছে? এক বছর পলিটেকনিকে কাটিয়েছে! শায়খ জালালুদ্দিন হাক্কানি কোন স্কুলের ছাত্র? কোন স্কুলের সনদদারী? একটি দীনি মাদরাসায়, যার নাম মাদরাসায়ে হাক্কানিয়া। আবদুল ওয়াহেদ যিনি বেগমানে বিদ্যমান, তার কী সার্টিফিকেট আছে? সে বলত রাশিয়া কোথায়? সে বেগমানের রাস্তায় বের হত এবং বলত, কোথায় রাশিয়া? আবদুল ওয়াহেদ পৌছলেন, তিনি একজন মূর্খ; সম্ভবত চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। আরবে যা কিন্ডারগার্ডেনের সমতুল্য। আর তারাই কিনা সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, তাদের সার্টিফিকেট কী? তাদের কীসের জ্ঞান রয়েছে? কোনো সমাধান নেই, কোনো আরাম নেই, ইসলাম ব্যতীত কোনো সমাধান হবে না কখনোই!

মানুষ নবিজির অনুসরণ করা ব্যতীত কখনোই শান্তি পাবে না। আর এ কারণে মানুষের জন্য আল্লাহর সেরা নিয়ামত হচ্ছে, রাসুলগণের প্রেরণ।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্টতই বিভ্রান্তিতে ছিল। [সুরা আলে ইমরান: ১৬৪]

'তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন।) যার কারণে তারা পবিত্র হয়, তাদেরকে তিনি কিতাব শিক্ষা দেন, যার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। তাদেরকে তিনি বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনেন।'

(তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে) এমন বলা হয় নি যে, 'তোমাদের থেকে' যেন এ কথা বোঝা যায় যে, রাসুল আমাদেরই একটি অংশ। তোমাদেরই কেউ একজন। কোনো বর্ণনার বাক্যগঠন ভিন্ন, তখন তার অর্থ হয়, তোমাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম। জমিনের মধ্যে একজন সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনি রাসুলই হবেন। নবিজি হাদিসে বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে কিনানকে নির্বাচন করলেন, কিনান থেকে কুরাইশকে নির্বাচন করলেন, কুরাইশ থেকে তিনি বনু হাশেমকে নির্বাচন করেছেন। আর বনু হাশেম থেকে আল্লাহ আমাকে নির্বাচন করেছেন। আর আমি হচ্ছি উত্তমের উত্তম।

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

'তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক।' [সুরা তাওবা- ১২৮]

নবিজি নিজেকে উপমা দিয়ে বলতেন, আমি তোমাদের (পায়ের গোড়ালি ধরে) জাহান্নামের আগুন থেকে আটকে রাখব। কারণ, এখানে পা ধরে ফেলা হচ্ছে সর্বোত্তম পদ্ধতি, যা কিনা লুঙ্গির জায়গা। আমি তোমাদেরকে আটকে রাখব। তিনি বলেন, তোমাদের উপমা হচ্ছে সেই বিছানার ন্যায়, যা কিনা আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর আমি তোমাদের প্রান্ত ধরে টানব, জাহান্নামের আগুনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। তারা তাকে কষ্ট দিচ্ছে, আর তিনি

তাদেরকে ভালবাসছেন। তারা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছে অথচ তিনি তাদের সঙ্গে দয়ার্দ্র হচ্ছেন। তারা তার সঙ্গে মুর্খতার আচরণ করছে, অথচ তিনি তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিচ্ছেন। তারা তাকে শাস্তি দিচ্ছে অথচ তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন। তারা তো বোঝে না!

জিবরাইল ﷺ অবতীর্ণ হলেন, যেদিন তিনি আবদু ইয়ালিল সম্প্রদায়ের সামনে নিজেকে সোপর্দ করলেন। তিনি বলেন, আমি হতবুদ্ধি হয়ে করনে সাআলিবে গিয়ে পৌঁছলাম। জিবরাইল আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এ হচ্ছে পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। আল্লাহ আপনাকে বলেছেন, আপনি তাকে আদেশ করুন আপনার যা খুশি। পাহাড়ের ফেরেশতা বললেন, আপনি যদি চান আমি আল আহমার এবং জাবালে আবি কুবাইস দিয়ে মক্কাকে ঢেকে দেব, তবে তাও করতে পারি। নবিজির উত্তর কী ছিল? তিনি বললেন, আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা হয়ত তাদের বংশধারা থেকে এমন কাউকে বের করে আনবেন, যে এই দীনকে বহন করবে। এই দীনকে ভালবাসবে!

এই তো দয়া। আমাকে আল্লাহ তায়ালার পথে এত পরিমাণে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, যা কাউকে দেওয়া হয় নি। যার কোনো দুঃখ-কষ্ট এসে আপতিত হয়, সে আমাকে দেখে শান্তনা গ্রহণ করে, আমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে এত কষ্ট দেওয়া হয় নি। নবিজিকে কষ্ট দেওয়া হত, তিনি তাদের প্রতি দয়া দেখাতেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন। তিনি প্রতিপালকের কাছে দুআ করতেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। এমনকি আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে এ কথা বলেছেন যে-

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.

'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া আর না চাওয়া সমান। আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।'

নবিজি বলেন, আমি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়ছিলাম, উমর আমাকে আটকে দিল। উমর বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তার জানাযার নামায পড়বেন, সে তো এমন এমন করেছে! নবিজি বললেন, হে উমর, আমাকে ছাড়, আল্লাহ আমাকে জানাযা পড়া এবং না পড়ার এখতিয়ার দান করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, 'আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া আর না চাওয়া সমান। আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।'

আমি সত্তর বারের বেশি পড়ব, এই মানবজাতির জন্য দয়া এবং রহমতস্বরূপ।

(মুমিনদের প্রতি তিনি অতিশয় দয়ালু।)

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ.

তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন রাসুল, তিনি যদি তোমাদের অধিকাংশের কথা অনুসরণ করে চলতেন, তবে তোমরা কষ্টের স্বীকার হতে। [সুরা হুজরাত: ৭]

অর্থাৎ যদি ওহি তোমাদের চাহিদা অনুসারে, তোমাদের ইচ্ছা মুতাবেক হত, তবে তোমাদেরই কষ্ট হত, পথভ্রষ্টতা, দুঃখকষ্ট তোমাদেরকে চেপে ধরত।

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ.

'তবে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন।' [সুরা হুজরাত: ৭]

তোমরা সত্যের অনুসরণ করেছ, যদিও তা তোমাদের নিকট তিক্তও হয়।

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

'ঈমানকে তোমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে, কুফর ফিসক, গুনাহ, নাফরমানিকে তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দেওয়া হয়েছে। আর তারাই হচ্ছে পথপ্রাপ্ত।' [সুরা হুজরাত: ৭]

(মুমিনদের প্রতি সুহৃদ, দয়ালু।)

ফুজাইল ইবনে হুসাইন বলেন, আল্লাহ তায়ালা নিজের গুণবাচক নামের দুটি নামকে কোনো নবির জন্যই একত্রিত করেন নি, একমাত্র আমাদের নবি মুহাম্মদ ছাড়া। আর তা হচ্ছে, রউফ এবং রহিম। আবার নিজের জন্যও তা একসঙ্গে ব্যবহার করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

'নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং দয়ালু।' [সুরা বাকারা- ১৪৩]

আর এরপরও মানুষ যদি নবিজি থেকে বিমুখ হয়েই পড়ে, তবে সে ব্যাপারে তিনি তাঁর নবিকে বলে দিচ্ছেন-

অর্থাৎ সমস্ত মানুষ যদি আপনার থেকে বিমুখ হয়ে যায়, আপনার সঙ্গে জিহাদ না করে অথবা আপনি যে বিষয় নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তার ওপর ঈমান না আনে, তবে আপনি বলুন-

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ.

'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। [সুরা তাওবা- ১২৯]

আবুদ দারদা থেকে আবু দাউদ শরিফে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি-

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

অংশটুকু সাতবার সকাল সন্ধ্যায় পড়বে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে যথেষ্ট হবেন, সে ঐ বিষয়ে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। এ তো হচ্ছে আবুদ দারদা-এর রেওয়ায়েত। কিছু মুহাদ্দিসকে আমি এ হাদিসের হাসান হওয়ার কথা বর্ণনা করতে দেখেছি। আর তাই বলব, মানুষেরা যদি আফগান জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তবে আপনিও বলুন-

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

এ তো চমৎকার একটি বিষয় যা দিয়ে সুরা তাওবা শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ আয়াত তো জিহাদের আয়াত। লড়াই সম্পর্কীত আয়াত। অর্থাৎ মানুষ যখন আপনার থেকে সরে পড়বে, ছিটকে পড়বে, আপনি দাঁড়িয়ে যান এবং লড়াই করুন, যদিও আপনি একাকী হোন না কেন! জেনে রাখুন! আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আর যদি তারা সবাই বিমুখ হয়েই যায়, তবে বলুন-

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

সুরা আলে ইমরানে মুমিনদের কথা বলা হচ্ছে-

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ.

'তাদেরকে মানুষেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক একত্রিত হচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু তা তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তো উত্তম কর্মবিধায়ক।'

তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট, তারা তারই অনুসরণ করেছিল আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা আল ইমরান: ১৭৩-১৭৪]

আর তাই বেশি বেশি করে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ বাক্যটি পড়তে থাকুন। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক, উত্তম অভিভাবক, উত্তম মাওলা, উত্তম সাহায্যকারী আর তাই বেশি বেশি করে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ বাক্যটি পড়তে থাকুন।

বুখারি শরিফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এই কালিমাটি ইবরাহিম ﷺ পড়েছিলেন, যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর আমাদের নবি মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

তাদেরকে মানুষেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক একত্রিত হচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদেকে ভয় কর; কিন্তু তা তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করেছিল এবং তারা বলেছিল, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ । আর তাই হাদিসে এসেছে, কারো ওপর যদি কোনো কিছু প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে সে যেন এই কালিমাটি বলে: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ।

সুতরাং, বেশি বেশি করে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ পাঠ করা উচিত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তবে তা কতটুকু বিশুদ্ধ তা আমি বলতে পারছি না। যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হল, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন মানুষের রূপ ধারণ করে বললেন, আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তিনি তাকে বললেন, আপনার কাছে

আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি চলে যেতে পারেন। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

حسبي الله لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله إلى الله ترجع الأمور.

তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.

আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সবাই তার আনুগত্য করে।

আল্লাহ কুরআনে বলেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ.

'আপনি বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে; তারা আসমান ও জমিনের কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এ দুটির কোথাও তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।' [সুরা সাবা: ২২]

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

যখন তিনি মহা আরশে অধিপতি, তখন এই সাত আসমান, সাত জমিন তার সিংহাসনের মধ্যে মরুভূমিতে পড়ে একটি বিন্দুর মতই মনে হবে। আর

সিংহাসনটি আরশের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি বিন্দু মনে হবে। এই হতবুদ্ধি বিন্দুটিকে জমিনের কে ভয় করবে-

আর তাই হে আমার নবি! আপনি বলুন-

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

আমার প্রিয় বন্ধুগণ

এই সুরা তাওবা তো জিহাদের সুরা। কিতাল এবং লড়াইয়ের সুরা। যেখানে যুদ্ধ বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, যেখানে জিহাদের বিধিবিধান চূড়ান্ত হয়েছে চিরদিনের জন্য। আর তাই আমাদের অন্যকোনো সুরার আয়াতের দিকে তাকানো প্রয়োজন হবে না। কারণ, জিহাদের জন্য শেষ বিধিবদ্ধ বিষয় হচ্ছে সুরা তাওবা।

আমার বন্ধুগণ, আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, বর্তমানে জিহাদ ফরজ। ফরজ বলতে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজে আইন। বাবার জন্য ছেলের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি শরিয়তের একটি বিষয় যে, কোনো ফরজে আইন বিধানের জন্য কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানে আফগানে, ফিলিস্তিনে, ফিলিপাইনে, তিশাদ, সিরিয়া, ইয়ামানসহ পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গাতেই জিহাদ ফরজে আইন। জিহাদ বলতে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সুতরাং আপনার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে আপনাকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। দীনের শত্রুদের সঙ্গে আপনাকে লড়াই করতে হবে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং আপনার নিজের দীন, আপনার সত্তার শত্রুদের সঙ্গে স্বশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হবে। যেমনিভাবে ইসলামের শত্রুরা সবকিছু নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। সবচে' সহজ এবং উত্তম জায়গা এই দীন কায়েমের জন্য, সে হচ্ছে আফগানিস্তানের ভূমি।

এই জাতিগোষ্ঠী, যা কিনা মজবুত ভিতে গড়ে ওঠা, যারা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ়।

আর আমার বন্ধুরা, যারা ঈমান-একিন রাখে না, তারা যেন তোমাদেরকে হালকা মনে না করে। তোমাদেরকে যেন শয়তান ধোকায় না ফেলে। তোমাদেরকে আল্লাহ যে বিষয়ের প্রতি হেদায়েত দান করেছেন, তা যেন তোমাদের থেকে ছিনিয়ে না নেয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃত পথ, যা আপনারা চিনতে পেরেছেন। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছনে ফিরে থাকবেন না। জিহাদ ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাবেন না, তবে কিন্তু দুনিয়া আখিরাত সবই হারাবেন। হ্যা দেশে ফিরতে পারেন, এই নিয়তে যে, আপনি সেখানের পরিবেশ্ পাল্টে দিবেন এবং তারপর আবার এখানে ফিরে আসবেন। এখানেই পথ খুঁজে নিন, আপনার মা অসুস্থ হোক বা সুস্থ হোক। কিংবা আপনার বাবার মৃত্যুই হয়ে যাক না কেন। আপনার মা অসুস্থ হলে তো আপনি নামায রোযা ছেড়ে দেন না, তেমনিভাবে জিহাদও ছেড়ে দেবেন না। সমস্ত উলামায়ে কেরামের মতানুসারে জিহাদ হচ্ছে অস্ত্রের জিহাদ। কাফেরদের সঙ্গে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করা, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অথবা তারা জিযিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত হয়ে এবং অবনতমস্তকে।

(আল্লাহর রাস্তায়) সাবিলিল্লাহ তার অর্থ হচ্ছে, অস্ত্র হাতে আল্লাহর দীনের জন্য লড়াই করা। এসব কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করুন। আল্লাহর বরকতে পথ চলতে থাকুন, নিজেদের পথে অটল থাকুন, সংশয়-সন্দেহ ঝেড়ে ফেলুন, অস্থির হবেন না, নিজের পেছনপানে ফিরে তাকাবেন না। জান্নাত আপনাদের সামনে। জেনে রাখুন, জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, আল্লাহর কসম, এখানের একটি দিন পৃথিবী এবং তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় একদিন রিবাত পাহারা দেওয়া দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় রিবাত করা পৃথিবীর যার ওপর সূর্য উদিত হয় এবং ডুবে যায়, তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় একদিন রিবাত অন্যপথের হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম, যেখানে রাতব্যাপী নামায এবং দীনব্যাপী রোযা রাখা হয়।

সমাপ্ত